আরব বিশ্বে

ইসরাইলের আগ্রাসী নীল নকশা
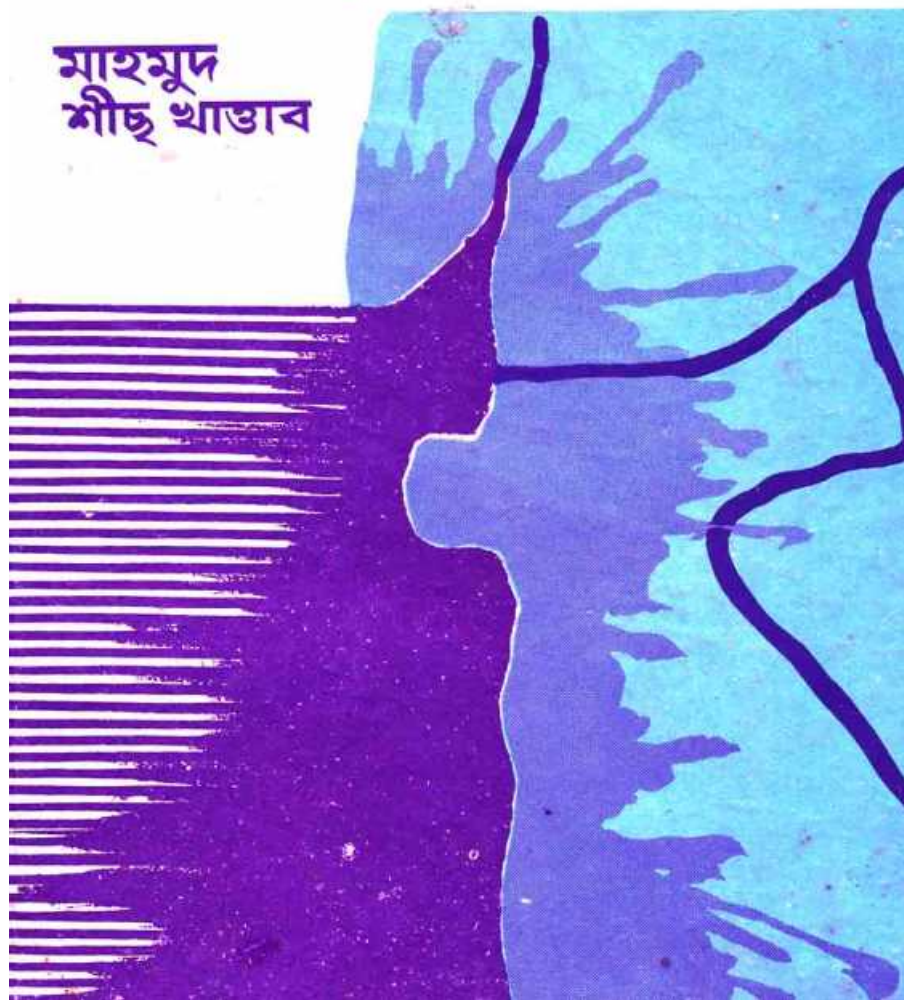
মাহমুদ শীছ খাত্তাব

আরব বিশ্বে ইসরাঈলের আগ্রাসী নীলনক্শা

আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব
অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আরব বিশ্বে ইসরাঈলের আগ্রাসী নীলনক্শা
মূল : মাহমূদ শীছ খাত্তাব
অনুবাদ : আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব
ই. ফা. বা. প্রকাশনা : ১৩৭১
ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার : ৩২৭.৫৬০৫৬৯৪
প্রথম প্রকাশ :
মাঘ ১৩৯৩
জমাদিউল আউয়াল ১৪০৭
জানুয়ারী ১৯৮৭
প্রকাশক :
অধ্যাপক আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা
প্রচ্ছদে :
আর. আই. মোল্লা
মুদ্রণে :
শেখ আবদুর রহীম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা
বাঁধাইয়ে :
এ. মবিন খান এণ্ড সন্স
৩৪, জিন্দাবাহার ১ম লেন
ঢাকা-২
মূল্য : ১৫.০০ টাকা

ARAB BISWEY ISRAILER AGRASI NEEL NAKSHA : (Israil's Extensional Ambitions in Arab Land) written by Mahmoud Shis Khattab in English, translated by Asadullah Al-Ghalib into Bengali and published by Prof. Abdul Ghafur, the Islamic Foundation Bangladesh. January 1987

Price : Tk. 15·00 U.S. Dollar : 1·00

প্রকাশকের কথা

আরব বিশ্বে ইসরাঈলী অবস্থান, আগ্রাসন, সম্প্রসারণ ও হত্যাযজ্ঞ বিভীষিকার রূপ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। মসজিদে আকসায় অগ্নিসংযোগ করে এ আগ্রাসী থাবা ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদীনার দিকে। আরব তথা মুসলিম বিশ্বের দুর্বলতার সুযোগে দিনে দিনে এ অক্টোপাশ তার বাহু-বেষ্টনে পিষ্ট করছে শহর-বন্দর জনপদ। এর উৎসে কাজ করছে তাদের সনাতন ধর্মচেতনা এবং এ কর্মকাণ্ডে পুরো বিশ্ব-য়াহূদী সমাজ ইস্পাত-কঠিন সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তার গতি সমস্ত অশুভ শক্তির মদদপুষ্ট হয়ে প্রবল ও দুর্বার হচ্ছে।

লেখক মাহমূদ শীছ খাত্তাব অত্যন্ত সুন্দরভাবে য়াহূদী পরিকল্পনা, আগ্রাসন ও ধ্বংসযজ্ঞ, তার দার্শনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক তৎপরতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং উম্মাহ্‌র প্রতি এ প্রেক্ষিতে তাঁর দিক নির্দেশনা এ বইয়ে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে তিনি মুসলমানদের তথাকথিত দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠে ঈমান, ইত্তেহাদ ও সূক্ষ্ম রণকৌশল অবলম্বন করে প্রকৃত শক্তিতে দুর্বার ও অজেয় হতে ডাক দিয়েছেন। গভীর প্রত্যয়ে দীপ্ত এই বই-এর অনুবাদ করেছেন জনাব আসাদুল্লাহ্‌ আল-গালিব। আশা করা যায়, বাংলাভাষী পাঠক সমাজ এ থেকে পরিস্থিতি যথাযথ জানতে পারবেন এবং মিল্লাতের মজলুম অংশটির প্রতি দায়িত্ব পালনে সজাগ হতে পারবেন।

ভূমিকা

এই বইখানি মাত্র এক মাসের কম সময়ের মধ্যে কায়রোতে মুদ্রিত হয়। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের আমলে দেশের ইসলামী বিষয়ক সুপ্রিম কাউন্সিল কর্তৃক প্রথম সংস্করণে ৫,০০০ কপি মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে ১১,০০০ কপি মুদ্রিত হয়, যা কায়রোর ইসলামী গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত হয়। দু'টি সংস্করণের সমস্ত বই মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই মিসরে বিক্রি হয়ে যায়। এই অকল্পনীয় সাফল্যের জন্য আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর অপার অনুগ্রহ ব্যতীত উহা কোন ক্রমেই হতো না।

এই বই মূলতঃ একটি গবেষণা পত্রের গ্রন্থরূপ মাত্র, যা বিগত ১৩৮৯ হিজরীর যিলহাজ মাস মুতাবিক ফেব্রুয়ারী ১৯৭০-এ কায়রোতে অনুষ্ঠিত ইসলামী গবেষণা কাউন্সিলের পঞ্চম অধিবেশনে পেশ করা হয় এবং এই গবেষণার উপর ভিত্তি করেই ইসলামী গবেষণা কাউন্সিলের উক্ত পঞ্চম অধিবেশনের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়, যে অধিবেশনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে মুসলিম জ্ঞানী-মনীষীগণ যোগদান করেছিলেন।

আমি এই বইয়ে আরব বিশ্বের প্রতি ইসরাঈলের সম্প্রসারণবাদী লালসার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছি কেবল মাত্র এই ভুল ধারণা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করবার জন্য যে, ইসরাঈল অন্য আরব ভূখণ্ডে নয় বরং শুধুমাত্র ফিলিস্তিনের উপরেই তার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবে। তাছাড়া য়াহূদী সম্প্রসারণবাদী নীতির পশ্চাতে মতবাদগত, অর্থনৈতিক, সামরিক অথবা রাজনৈতিক দিকগুলি সম্পর্কেও আমি আলোকপাত করেছি।

উক্ত আলোচনার জন্য আমি ইসরাঈলের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন উপলক্ষে দেওয়া বক্তৃতা-বিবৃতি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত

নিবন্ধসমূহের অংশ বিশেষ, সরকারী প্রকাশনা ও তাদের রেডিও টেলিভিশনের প্রচারণাসমূহকে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছি। উপসংহারে আমি তাদের বাস্তব কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরেছি।

এই বই পুনঃমুদ্রণের উদ্দেশ্য, যাতে এই বই শুধু আরবদের নয় বরং সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়।[১]

পরিশেষে আমি প্রার্থনা করি আল্লাহ্‌র নিকট যেন তিনি অধিক সংখ্যক লোককে এই বই হতে উপকার লাভের তওফিক দান করেন। আমি মহাশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রণতি নিবেদন করছি এবং দরূদ পেশ করছি তাঁর শেষনবী সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামের উপর। ইতি—

কায়রো — মাহমুদ শীত্ব খাত্তাব

৩রা জমাদিউল আউয়াল ১৩৯০ হিঃ
৬ই জুলাই ১৯৭০ ইং

১. অনুবাদকের মূল উদ্দেশ্যও তাই, যাতে বাংলার প্রতিটি মুসলিমের ঘরে ঘরে য়াহুদীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। —অনুবাদক।

আরব বিশ্বে
ইসরাঈলের আগ্রাসী নীলনক্শা

কথা শুরু

যারা মনে করেন যে, ইসরাঈল একটি দুর্দৈব শক্তি। এ কেবল ফিলিস্তিনের উপর আপতিত হয়েছে। এর লালিত আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা ফিলিস্তিনের সীমানা অতিক্রম ক'রে অন্যের দিকে ধাবিত হবে না--তারা য়াহূদীদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। বরং বাস্তব সত্য এটাই যে, ইসরাঈলী বিষফোঁড়া আজ আরবদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও ঐতিহাসিক অস্তিত্বের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর উপর আক্রমণ ও দখল কায়েম করার জন্য ইসরাঈল বর্তমানে বস্তুগতভাবে একটি সুসজ্জিত ত্রাস।

ইসরাঈলের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে, যার মধ্যে য়াহূদীদের সম্প্রসারণবাদী, আগ্রাসী লালসা ও ভবিষ্যত চক্রজাল পরিকল্পনা লুকিয়ে আছে--আমাদেরকে ইসরাঈলী সম্প্রসারণবাদের মুখোস উম্মোচনে সাহায্য করবে এবং এর ফলে আরবরাও সজাগ হতে পারবে যে, কিভাবে তারা ভবিষ্যত ইসরাঈলী আগ্রাসন থেকে নিজেদের দেশগুলোকে রক্ষা করবে।

ইসরাঈলের প্রস্তুতি পর্বকে আমরা দু'টি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি ঃ

১. **১৮৯৭ খৃস্টাব্দের পূর্বের সময়কাল ঃ** যখন য়াহূদীবাদ তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে ব্যাপৃত ছিল।

২. **১৮৯৭ খৃস্টাব্দের পরবর্তীকাল ঃ** য়াহূদীবাদী আন্দোলন একটি সাংগঠনিক কাঠামো লাভ করলো এবং উক্ত সালে সুইজারল্যাণ্ডের 'ব্যাসল' নগরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম য়াহূদী সম্মেলনে গৃহীত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে একটি নিয়মিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করলো।

ইসরায়েল কোহেন (Israel Cohen) তার 'য়াহূদীবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নামক বইয়ে লেখেন যে, য়াহূদীবাদী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হলো তাদের প্রাচীন স্বদেশ ভূমি ফিলিস্তিনকে পূর্ণভাবে নিজেদের দখলে ফিরিয়ে আনা।[১]

খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়াহূদীবাদ বাইবেলের (The Bible) সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হয়নি এবং বিভিন্ন উৎসবাদি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও ফিলিস্তিনে পুনরায় ফিরে যাওয়ার য়াহূদী আকাঙ্ক্ষা ছিল পুরোপুরি ধর্মীয় বিশ্বাসের অংগীভূত বিষয়।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের 'ব্যাসল' নগরীতে সর্বপ্রথম য়াহূদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন শেষ হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরে 'হার্জেল' তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন--'আমি যদি ব্যাস্‌ল সম্মেলনের ফলাফল এক কথায় বলতে চাই---যদিও তা আমি প্রকাশ্য ভাবে বলতে চাই না, তবে তা হ'লো এই যে, য়াহূদী রাষ্ট্রের ভিত্তি উক্ত ব্যাস্‌ল সম্মেলনেই স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এটা এখন যদি আমি সে কথা বলি তবে পৃথিবীর লোকেরা আমাকে টিটকারী দেবে। এটা পাঁচ বছরেও হতে পারে, তবে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সুনিশ্চিত যে, আমার এই কথা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করবে। লোকদের মনে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অংকিত হয়েছে, তা অবশ্যই আমার উক্ত বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে।'[২]

ব্যাস্‌ল নগরীতে ঐ দিন কি ঘটেছিল? কি কি মৌলিক নীতি ও প্রস্তাবসমূহ সেখানে গৃহীত হয়েছিল?

য়াহূদীবাদের এই প্রথম সম্মেলন তাদের বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তসমূহকে একীভূত করে। যা তারা কূটনৈতিক ও কৌশলগত পথ-পরিকল্পনায় এবং এর মানবিক ও বস্তুগত অস্তিত্ব বাস্তবায়নের উপায় উদ্ভাবনে এক হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ য়াহূদী জাতিতে পরিণত হতে পারে। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহে তাদের যে মূল উদ্দেশ্য বিধৃত হয়েছে, সেটি হলো য়াহূদীদের জন্য ফিলিস্তিনে একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা, যা সর্বসাধারণের গৃহীত আইন অনুযায়ী শাসিত হবে। সম্মেলন

---

১. A short History of Zionism: Israel Cohen-New York 1951.

২. Memoirs of Theodore Hertzel : Translated into English by Harry en, N. Y. 1960 (8511-2)

মনে করে যে, নিম্নোক্ত উপায়সমূহ তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে ঃ

১. স্পষ্ট মূলনীতির অনুসরণে য়াহূদী কৃষি ও শিল্প কর্মীদের দ্বারা সমস্ত ফিলিস্তিনকে একটি কলোনীতে পরিণত করা।

২. প্রত্যেক দেশে প্রচলিত আইন-কানুনের সংগে সংগতি রেখে বিশ্ব য়াহূদী সংগঠন ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা।

৩. য়াহূদীদের জাতীয় অনুভূতি উন্নয়ন ও শক্তিশালী করা।

৪. নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে সরকারী সম্মতি ও অনুমোদন আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এইভাবে উক্ত সম্মেলন ঘোষণা করলো যে, য়াহূদীরা একটি সম্প্রদায়গত ও ধর্মীয় সত্তা হিসেবে রূপ লাভ করেছে। তাই পরিপূর্ণ অর্থে একটি 'জাতি' হিসেবে তাদের একটি নিজস্ব আবাস ভূমি প্রয়োজন এবং সেটি অবশ্যই হতে হবে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিশ্রুত ভূমি-'ফিলিস্তিনে'।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

'ব্যাস্‌ল নগরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম য়াহূদী সম্মেলনের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই য়াহূদীরা অনেকগুলি সংস্থা ও নিশ্চিত ফলদায়ক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। যেমন ঃ য়াহূদী কংগ্রেস, কার্যনির্বাহী কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি, কলোনীগুলোর জন্য য়াহূদী ব্যাংক (১৮৯৮), কলোনী সম্বন্ধীয় কমিটি (১৮৯৮) এবং জাতীয় য়াহূদী ফাণ্ড (১৯০১)। এই প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও কমিটিসমূহ গঠনের পিছনে মূল কারণ ছিল ফিলিস্তিনকে কলোনী বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় ফাণ্ড সংগ্রহ করা, উক্ত কার্যক্রমের সংগঠন ও সমন্বয় সাধন করা এবং ব্যাস্‌ল সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক য়াহূদী প্রচেষ্টাকে সুসংবদ্ধ করা।[৩]

সম্ভবত প্রথম দৃষ্টিতেই সকলে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, 'হার্জেল' (Hartzel) তাঁর সমস্ত লক্ষ্যের মধ্যে একটি শ্লোগানেরই অবতারণা করেছেন, যেটি তিনি স্বীয় স্মৃতিকথায় নিশ্চিত করে বলেছেন, সেটি হলো—স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কারও কোন পন্থাই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।[৪]

য়াহূদীবাদ একটি মূল নীতিতেই বিশ্বাসী। সেটি হলো The end justifies the means—অর্থাৎ লক্ষ্যই উপায় নির্ধারণ করে থাকে। অতএব নিজেদের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যে কোন কৌশল অবলম্বন করা থেকে বিরত হওয়া চলবে না—তা যতবড় নৈতিকতা বিরোধী কৌশলই সেটা হোক না কেন।

---

৩. বিস্তারিত দেখুন ঃ 'Zionist-expansion aims' : Abd-el-Wahhab el-Kayall, Beirut, 1966 P. 7--24.

৪. Hartzal's Memoirs (1616-4)

নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিসের কিনারা পর্যন্ত ফিলিস্তিনের সীমানা বলে য়াহ্‌দীরা মনে করে থাকে। হার্জেল বলেন, "এই পরিকল্পিত সীমানা প্রতিষ্ঠার আগে অবশ্যই একটা পট পরিবর্তনের সময়কাল অতিক্রম করতে হবে, যে সময়কালের মধ্যে ফিলিস্তিন অবশ্যই য়াহ্‌দী গভর্নর কর্তৃক শাসিত হবে এবং যখন য়াহ্‌দী অধিবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ হবে, তখন এই অঞ্চলের উপর য়াহ্‌দী আধিপত্য চেপে বসবে।"

প্যালেস্টাইনে কলোনী স্থাপন প্রকৃত প্রস্তাবে শুরু হয় ১৯০৭-১৯০৮ সালে একটি পরিকল্পিত নীলনকশা অনুযায়ী য়াহ্‌দী উদ্বাস্তুদের আগমনের সূত্র ধরে। উক্ত নীলনকশা প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন অংশে য়াহ্‌দী কলোনী-সমূহের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বলিত ছিল। একেই পরবর্তীকালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক তাদের নিকট স্বেচ্ছায় প্রদত্ত 'সাইক্‌স প্রস্তাবসমূহ' প্রত্যাখ্যানের ছুতা হিসেবে দাঁড় করানো হয়। ১৯১৫ সালে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'সাইক্‌স-পিকো' গোপন চুক্তি অনুযায়ী উক্ত প্রস্তাব পেশ করা হয়। এতে প্রস্তাবিত সীমানা অনুযায়ী আপার গ্যালিলির (Upper Galilee) কলোনীসমূহ থেকে য়াহ্‌দীদের বঞ্চিত করা হতো এবং প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক এলাকা দ্বারা য়াহ্‌দীদেরকে তাদের স্বদেশ ভূমি জেরুজালেম ও হাইফা বন্দরের নিকটবর্তী কলোনী-সমূহ থেকে বঞ্চিত করা হত।[৫]

য়াহ্‌দী ম্যাগাজিন 'প্যালেস্টাইন' ১৯১৮ সালের ১৯শে অক্টোবর সংখ্যায় সংক্ষেপে য়াহ্‌দী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সমূহ বর্ণনা করে নিম্নভাবে— 'য়াহ্‌দী প্যালেস্টাইন অবশ্যই সমগ্র প্যালেস্টাইন নিয়েই গঠিত হবে। তার মধ্যে কোনরূপ বিভক্তি তারা কখনোই স্বীকার করবে না। ১৯১৫ সালে সম্পাদিত 'সাইক্‌স-পিকো' চুক্তি অবশ্য এর উত্তর সীমানাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু অবিভক্ত প্যালেস্টাইন অবশ্যই ফ্রান্স, জর্দান, গ্যালিলী এবং ভূমধ্য সাগরীয় উপকূলকে সংযুক্ত করবে। [৬]

---

৫. Friscos Raanan: The Frontiers of a Nation, London 1955, p.78.
৬. The Palestine magazine, 4th Vol. No. 11.

ইসরাঈলী লক্ষ্য

জর্ডানে

ইসরাঈলী প্রধান মন্ত্রী মেনাহিম বেগিন প্রতিটি অনুষ্ঠানে জর্ডানকে শত্রু কবলিত এলাকা' হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। বেগিন যে কথা বলেন সে কথাই তাদের স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের শেখানো হয়।

য়াহূদীদের উচ্চাভিলাষ বিশেষভাবে প্রতিভাত হয় ১৯১৭—২০ সালের মধ্যে, যখন তারা কৃষি, সেচ ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির দাবীতে আন্দোলন কেন্দ্রীভূত করলো, যাতে প্যালেস্টাইন প্রতিরক্ষা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের উপর ইসরাঈলের কূটনৈতিক আধিপত্য নিশ্চিত করা যায়।

য়াহূদীরা ট্রান্স-জর্ডানকে তাদের স্বদেশ ভূমি প্যালেস্টাইনের সংগে সংযুক্ত করার ব্যাপারে খুব জোর দেয়। তাদের সরকারী প্রকাশনাসমূহেই একথা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে যখন প্যালেস্টাইনের উপর বৃটেনের সামরিক ম্যাণ্ডেট ঘোষিত হলো, তখন য়াহূদীদের পরিচালিত 'প্যালেস্টাইন ম্যাগাজিন, 'ইন্টারন্যাশনাল জিওনিস্ট রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকায় ট্রান্স-জর্ডানকে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা থেকে পৃথক করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।[৭]

১৯১৯ সালের ২৮শে জুন সংখ্যা 'প্যালেস্টাইন' ম্যাগাজিন ট্রান্স-জর্ডানের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করে যে, ভবিষ্যতে য়াহূদী রাষ্ট্রে প্যালেস্টাইনের জন্য অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ট্রান্স-জর্ডানের অপরিহার্য গুরুত্ব রয়েছে। য়াহূদী প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যত সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে ট্রান্স-জর্ডানের উপর। প্যালেস্টাইন ততদিন পর্যন্ত নিরাপদ নয়, যতদিন না তা ট্রান্স-জর্ডান-এর একটি অংশে পরিণত হচ্ছে। ট্রান্স-জর্ডান হলো প্যালেস্টাইনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি।

৭. 'Palestine' issue of 23.11.1919.

য়াহ্দী সংস্থা কর্তৃক শান্তি সম্মেলনে (peace conference) পেশকৃত স্মারকলিপিতে জর্ডান নদীর পূর্ব তীরকে প্যালেস্টাইনের সাথে সংযুক্ত করার ব্যাপারে স্পষ্ট দাবী করা হয়। এই সংযুক্তির পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে উক্ত স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, খৃস্টীয় প্রথম যুগে (Biblical days) জর্ডান নদীর পূর্বতীরের উর্বর ভূমি এর পশ্চিম তীরের সাথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকদিয়ে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিল। আজকের দিনের স্বল্প জনসংখ্যা বিশিষ্ট ট্রান্স-জর্ডান রোমকদের শাসনামলে খুবই ঘনবসতি পূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। অতএব বর্তমান কালের নয়া উপনিবেশ (অর্থাৎ য়াহ্দী বসতি স্থাপনকারীদের) তাতে স্বাগত জানানো অধিকতর যুক্তিসংগত।

ট্রান্স-জর্ডানে কৃষি উন্নয়ন প্যালেস্টাইন ও লোহিত সাগরের মধ্যে মিলন-স্থলে পরিণত করবে এবং এর ফলে আকাবা উপসাগরে ভাল ভাল বন্দর স্থাপন করা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সোলায়মানের (Days of Solomont) আমলে 'আকাবা' নগরী প্যালেস্টাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়-পথের প্রান্তসীমা (Terminus) ছিল।

যখন বৃটেন ট্রান্স জর্ডান আমীরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিল, তখন য়াহ্দী আন্দোলন এর তীব্র বিরোধিতা করে এবং জর্ডানের এই নতুন অবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করে। য়াহ্দী নেতাদের বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয় যে, এর দ্বারা প্যালেস্টাইনকে তার দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি থেকে এক আঘাতে বঞ্চিত করা হয়েছে।

য়াহ্দীরা ট্রাস-জর্ডানে কলোনী স্থাপনে বার বার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আশা ছাড়েনি; বরং উল্টা হেজাযী রেলওয়ে পর্যন্ত একটা বিরাট এলাকা প্যালেস্টাইনের সংগে জুড়ে দেওয়ার জন্য তীব্র চাপ অব্যাহত রাখে। জর্ডানের বর্তমান লোকসংখ্যার ৯৯% শতাংশ এখানেই বসবাস করে। ওয়াইজম্যান জর্ডান আমীরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে মন্তব্য করেন যে, প্যালেস্টাইনে অধিকহারে য়াহ্দী বসতি স্থাপনই জর্ডানে আধিপত্য বিস্তারের উপায়।[৮]

য়াহ্দী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যারা য়াহ্দী নেতাদের প্রদত্ত ঘোষণাপত্র ও লিখিত স্মৃতিকথাসমূহ পড়েছেন তারা ইসরাঈলের এ বিশ্বাস অবশ্যই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, জর্ডান নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা দখল করা তাদের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক

৮. 'Palestine' magazine volume 5, No. 20.

দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নিষ্পন্ন কার্য (Fait accompli) এবং য়াহূদীরা যে কোন সুযোগে জর্ডান দখল করতে কঠিন সংকল্পবদ্ধ।[৯]

সিরিয়ায়

১৯১৭ সালের ২৩শে জুন সংখ্যা 'প্যালেস্টাইন' ম্যাগাজিন সিরিয়ার 'হুরান' সমতল ভুমি সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ শুরু করে এইভাবে 'নতুন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য হুরানের চাইতে অধিকতর প্রভাবশালী এলাকা আর নেই।'

উক্ত প্রবন্ধে হুরান সমতল ভুমির বিরাট এলাকা নির্দেশ করা হয়েছে। দক্ষিণে যারকা, যা উত্তরদিকে রাজধানী দামেশ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত, পশ্চিমে গৌর (Gour) অথবা জর্ডান উপত্যকা, পূর্বে তা ক্রমে গোলান (Joulan) মালভুমি এবং উত্তরের লাজা (Laja) আগ্নেয়গিরি সমূহ ও দক্ষিণের বালকা-ভুমি (Balka land) পর্যন্ত বিস্তৃত।

১৯১৮ সালের জুন সংখ্যা 'প্যালেস্টাইন' সাময়িকী প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ান এবং ওয়াইজম্যানের পরবর্তী ইসরাঈলী প্রেসিডেন্ট আইজাক বেন জিভি কর্তৃক লিখিত 'প্যালেস্টাইনের সীমানা ও এর আয়তন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। যেখানে প্যালেস্টাইনের আয়তন হিসেবে পশ্চিমে ভুমধ্য সাগর, উত্তরে লেবানন পাহাড়, পূর্বে সিরিয়ার মরুভুমি এবং দক্ষিণে সিনাই উপদ্বীপ (Peninsula) দেখানো হয় এবং বলা হয় যে, এটাই হলো প্যালেস্টাইনের প্রাকৃতিক সীমানা।[১০]

দুইজন লেখক এইভাবে য়াহূদী আন্দোলনের দাবীসমূহ বর্ণনা করেন এবং পরিশেষে উপসংহার টানেন এই বলে যে, "অন্যকথায় প্যালেস্টাইন অন্তর্ভুক্ত করতে চায় সমগ্র নাজার, জুদিয়া, সামারিয়া গ্যালিলি, হুরান জেলা, মাআনও আকাবা সহ কার্ক জেলা এবং কুনেত্রা, ওয়াদী আনজার ও হাসবিয়া সহ দামেশ্ক জেলার একাংশ।[১১]

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কৃষি, পানি প্রবাহ, সামরিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিধায় য়াহূদীরা দখল করে নিতে চায় হুরান

---

৯. Collected papers: The Arab cultural club, Beirut, P.1. See also Zionist expension aimes, p. 74-77.

১০. 'Palestine' magazine Vol. 3 No. 17.

১১. Zionist expansion aims, p. 77-81.

সমতল ভূমি ও হারমন পাহাড়—যা প্যালেস্টাইনে পানি সরবরাহ করে। তারা দখল করতে চায় দামেশ্‌ক জেলা এমন কি দামেশ্‌ক মহানগরী এবং দামেশ্‌ক ও বর্তমান লেবানন—লিবিয়া সীমান্তের মধ্যস্থিত বিস্তৃত অঞ্চল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে স্বস্তি পরিষদের নিকট পেশকৃত একটি সরকারী স্মারকলিপিতে (Official memorandum) কৃষি, সেচ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দোহাই পেড়ে য়াহুদীরা সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ দাবী করে বসে। উক্ত স্মারকলিপি থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা হলো :

> প্যালেস্টাইনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করছে সিরিয়ায় অবস্থিত পানির উৎসসমূহের উপর। এবং এটা অত্যন্ত জরুরী যে, প্যালেস্টাইন তার প্রয়োজনীয় পানি প্রবাহের নিশ্চয়তা লাভ করবে যা দেশকে যথা-রীতি পানি সিঞ্চন করবে এবং এর সংরক্ষণাগারের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে। হারমন পাহাড়, যাকে এক সময় প্যালেস্টাইনে পানির পিতা বলা হতো—দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া ব্যতীত কোনক্রমেই এটাকে প্যালেস্টাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এটা অবশ্যই পুরোপুরিভাবে তাদের অধিকারে থাকতে হবে—যারা এ থেকে অধিকতর সুবিধা ভোগ করে থাকে।

উপরের আলোচনায় এটা পরিষ্কার যে, ইসরাঈল তার মধ্যে শামিল করে নিতে চায় দামেশ্‌ক মরুভূমির পূর্বের প্রত্যন্ত সীমানা পর্যন্ত এবং দামেশ্‌কের দক্ষিণে সিরিয়া-প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া-জর্ডান সীমান্তের মধ্যবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল।

১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্মলাভের বহু পূর্বে এগুলো ছিল সিরিয়ার উপরে য়াহুদীদের নম্র (modest) দাবী। আজকের দিনে তারা ইস্কান্দারুন জেলা পর্যন্ত সমগ্র সিরিয়াকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।

লেবাননে

প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি যুগ থেকেই য়াহুদীদের লেবানন দখলের স্বপ্ন ছিল। এ ব্যাপারে দক্ষিণ লেবাননকে অধিক গুরুত্ব প্রদানের পিছনে দু'টি প্রধান কারণ সক্রিয় ছিল :

(ক) জর্ডান নদীর উৎস এবং লিতানী নদীর মূল স্রোত ও মোহনা এই এলাকায় অবস্থিত।

(খ) ভবিষ্যত য়াহূদী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যাপারে এই অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব।

এ কথা স্পষ্ট যে, এ দু'টি উদ্দেশ্যই ছিল ইসরাঈলের সর্বাবস্থার ও সকল সময়কার একমাত্র চিন্তা-ভাবনা।

১৯১৭ সালের মে সংখ্যা, 'প্যালেস্টাইন সাময়িকী'তে একটি নিবন্ধে মত প্রকাশ করা হয় যে, লেবাননের বেনিয়াস (Banious) য়াহূদী গোত্রীয় অধিকারভুক্ত এলাকার একটি অংশ ছিল। এইভাবে য়াহূদীদের সকল প্রবন্ধ ও বিবৃতিতে দক্ষিণ লেবানন দখলের ও একে প্যালেস্টাইনের সংগে সংযুক্ত করার ব্যাপারে তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখা যায়। স্বস্তি পরিষদের (Peace Congress) নিকট পেশকৃত তাদের একটি স্মারকলিপিতে অন্যান্য দাবীর মধ্যে দক্ষিণ লেবাননের উপর তাদের দাবীর কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

উক্ত স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, 'প্যালেস্টাইনের সীমানাসমূহ নিম্নোক্ত সীমান্ত রেখা অনুযায়ী হ'তে হবে। যথা ঃ উত্তরে সিডন বন্দরের সন্নিকটবর্তী ভূমধ্য সাগর থেকে লেবাননী পর্বতমালার নিম্নবর্তী কারওয়ান ব্রীজ অতঃপর 'আল-বিরাহ' পর্যন্ত, সেখান থেকে ওয়াদিউল কার্ণ এবং ওয়াদিউত্-তীন-এর দুই অববাহিকার মধ্যবর্তী বিভক্তি রেখা বেয়ে দক্ষিণে মোড় নিয়ে হারমন পাহাড়ের পূর্ব ও পশ্চিমের ঢালুদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিভক্তি রেখা বরাবর এগিয়ে যাবে। য়াহূদীরা তাদের এই সরকারী স্মারকলিপিতে জর্ডান ও লিতানী নদীর দুই পানির উৎসের উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণলাভের বিষয়ে জোর দিয়েছে।'

য়াহূদীদের মুখপাত্র 'প্যালেস্টাইন' সাময়িকীতে ১৯১৯ সালের ২রা নভেম্বর সংখ্যায় পরামর্শ দেওয়া হয় যে, উত্তর সীমানা সিডানের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং এই প্রাচীন নগরী সিডনকে প্যালেস্টাইন ভূমির সংগে সংযুক্ত করে নেওয়ার পরে তা বৈরুতের উপকণ্ঠ পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে।

উক্ত সাময়িকীর ১৯১৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর সংখ্যায় য়াহূদী আন্দোলনের নেতারা লেবানন সম্পর্কে তাঁদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন নিম্নোক্তভাবে ঃ

মূল সত্য এটাই যে, প্যালেস্টাইন সীমান্ত এলাকায় সেচ ও পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পানির প্রবাহ কব্জা করা একান্ত জরুরী বিষয়। সে

কারণে লিতানী নদী ও জর্ডান নদীর উৎসসমূহ এবং হারমন পর্বত-মালার তুষার পিণ্ডসমূহ অবশ্য প্রয়োজন।[১২]

উত্তর সীমান্ত ও এর পানি প্রবাহগুলোর ব্যাপারে একই ধরনের বক্তব্য আমরা দেখতে পাই হার্বার্ট স্যামুয়েলের চিঠিতে—প্যারিস শান্তি আলোচনায় যিনি বৃটিশ প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য ছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন ঃ

প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে এর সম্প্রসারণের উপর। যাতে দেশটি সমস্ত য়াহুদী উদ্বাস্তুদেরকে জায়গা দিতে সক্ষম হয়। সংগে সংগে উক্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নির্ভর করছে শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের উপর। আর এই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন পানি ও পানি-বিদ্যুতের অবিরত যোগান, যা পাওয়া যেতে পারে উত্তর সীমান্তের দেশগুলো থেকে—য়াহুদী প্রস্তাব অনুযায়ী যা ভবিষ্যত প্যালে-স্টাইন রাষ্ট্রের সংগে সংযুক্ত হবে।[১৩]

সীমান্ত এলাকার উপর বৃটেন ও ফ্রান্সের যৌথ ম্যাণ্ডেট প্রতিষ্ঠিত হলে য়াহুদীরা এই চুক্তির বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করে এইজন্য যে, এতে তাদেরকে লিতানী নদী, আপার জর্ডান, হারমন পর্বতমালা এবং হরান সমতল ভূমি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। লেবানন ও লিবিয়ায় য়াহুদী বসতি স্থাপনের মাধ্যমে তারা শান্তিপূর্ণ উপায়েসীমানা নির্ধারণে কিছুটা রদবদল করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ফ্রান্সের তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হয়। এইভাবে য়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কিংবা পরে পানির উৎসসমূহ দখল করার ব্যাপারে তারা তাদের প্রচেষ্টাকে কখনোই হালকা করেনি। ১৯৫১ সালের মে মাসে ইসরাঈলী পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবা ইবান ঘোষণা করেন যে, আমরা আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো জর্ডান এবং তার পানির উৎসসমূহের ব্যাপারে।[১৪]

আমেরিকার একটি য়াহুদী সাময়িকী বক্তব্য রাখে—ইসরাঈলীদের নিকট এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, তাদের নাজাব (Nagab) এলাকা

---

১২. The Palestine Magazine, Volume 6, No. 17.

১৩. The British Government documents, year 1919, Vol. 4, No. 197, article 3, P. 285.

১৪. Zerusalem post paper, Issue of May 2, 1951.

উন্নয়নের স্বপ্ন কখনই বাস্তবে রূপায়িত হবে না লিতানী নদীর পানি ব্যতীত।[১৫]

অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজনে ইসরাঈলী আগ্রাসী লক্ষ্যসমূহের মধ্যে লেবাননী ভূখণ্ডকে অত্যন্ত গুরুত্বের সংগে তারা বিবেচনা করে থাকে। এজন্য তাদের প্রধান লক্ষ্য দক্ষিণ লেবানন—যা লেবাননের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে এবং অন্যতম লক্ষ্য জর্ডান ও লিতানী নদীর উৎসসমূহ দখল করা।[১৬]

লেবাননে য়াহূদী আগ্রাসনের শেষ লক্ষ্য হলো রাজধানী বৈরুত শহর ও লেবাননের পাহাড় দখল করা। সঙ্গে সঙ্গে পানির উৎসের নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে ক্রমে এর উত্তর সীমানাসহ সমগ্র লেবানন কব্জা করা। লেবাননে ক্রমবর্ধমান য়াহূদী তৎপরতা আরব দেশসমূহে তাদের সম্প্রসারণ-বাদী আকাঙ্ক্ষার কথা তাদের অজ্ঞাতেই প্রকাশ করে দিয়েছে।[১৭]

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে [মিসরে]

হার্জেল (Hartzel) বলেন যে, "সিনাই এবং আল-আরিশ হলো স্বদেশে প্রত্যাগত য়াহূদীদের আবাসভূমি।"

১৯০২ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে হার্জেল কলোনী বিষয়ক বৃটিশ মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলিনের সংগে দেখা করেন যিনি য়াহূদীদের প্রতি সহানুভূতির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। হার্জেল স্বীয় স্মৃতিকথায় বলেন যে, তিনি বৃটিশ মন্ত্রীর নিকট আল-আরিশ প্রজেক্টের সাথে হাইফা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যোগসূত্রের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বিপুল সংখ্যক য়াহূদী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য প্যালেস্টাইনের নিকট-বর্তী কোন এলাকা বেছে নেবার কথা ব্যক্ত করেছেন। সাক্ষাৎকারের শেষ দিকে হার্জেল বৃটিশ মন্ত্রীর প্রতি সরাসরি প্রশ্ন রাখেন—"আপনি কি সিনাই উপদ্বীপে য়াহূদী বসতি অনুমোদন করেন?" উত্তরে মন্ত্রী বলেন—"হ্যাঁ, যদি (মিসরের গভর্ণর) লর্ড ক্রোমার (Kromer) তা অনুমোদন করেন।"[১৮]

---

১৫. Middle Eastern Affairs, Issue at the beginning of the year 1955.

১৬. Zionist expansion aggressive aims. P. 71-97.

১৭. বিগত ৬ই জুন '৮২-তে দক্ষিণ লেবাননের উপর ইসরাঈলের সর্বাত্মক আক্রমণ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। —অনুবাদক

১৮. Hertzel's memoirs, 1360—62-2.

এই সাক্ষাৎকারের পর হার্জেল তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন যে, বৃটেন ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে একটি স্বায়ত্বশাসিত য়াহ্ূদী কলোনী স্থাপনে অনুমোদন দিয়েছে।[১৯]

উপরিউক্ত সাক্ষাৎকারের পর পরই এবং বৃটিশ মন্ত্রী লর্ড ল্যান্স-ডনের পরামর্শ মতে বৃটেনের পররাষ্ট্র সচিব হার্জেলকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁকে আল-আরিশ উপত্যকার ও সিনাই উপদ্বীপে য়াহ্ূদী বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা অনুমোদনের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেন। শুধু তাই নয়, মিসরে হার্জেলের সফর ও তার অনুসন্ধানী দলকে বিশেষ সুবিধাদানের জন্য গভর্ণর লর্ড ক্রোমারকে তিনি চিঠি লেখারও ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।[২০]

হার্জেলের বিশেষ দুত এর পর পরই বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর চিঠি ও কলোনী বিষয়ক মন্ত্রীর অনুমোদন পত্র নিয়ে মিসর রওয়ানা হয়ে গেলেন। ১৯০৩ সালের ১৩ই নভেম্বরে হার্জেল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখলেন—'গ্রীনবার্গ[২১] মিসর থেকে আশাতীত সাফল্য নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি আমাদের স্বার্থের পক্ষে লর্ড ক্রোমার এবং প্রধান মন্ত্রী বুত্রস গালী পাশা উভয়কেই জয় করে নিয়েছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা, সেটা হলো তিনি মিঃ বয়েল (Mr. Boyle) এবং ক্যাপ্টেন হান্টারসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশিষ্ট বৃটিশ অফিসারদের আস্থা অর্জনে সফল হয়েছেন।

১৯০৩ সালে 'য়াহ্ূদী কমিটি' নামে একটি কমিটি—হার্জেল নিজে যার অন্যতম সদস্য ছিলেন, মিসর সফরে যায় এবং গভর্নর লর্ড ক্রোমারের আলোচনায় বসে। গভর্নর অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের দাবীসমূহের প্রতি সাড়া দেন এবং উক্ত য়াহ্ূদী কমিটিতে নিজের একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। কমিটি সিনাই ও আরিশ এলাকায় ব্যাপক য়াহ্ূদী বসতি স্থাপনের সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য সেখানে একটি অনুসন্ধানী টীম প্রেরণ করেন।

এটা সিদ্ধান্ত ছিল যে, যদি উক্ত অনুসন্ধান রিপোর্টে এ কথা বুঝা যায় যে, ভূখণ্ডটি ব্যাপক য়াহ্ূদী বসতির উপযোগী, তাহ'লে য়াহ্ূদীদেরকে এই সুবিধা মন্জুর করা হবে যে, আগামী ৯৯ বৎসরের জন্য বৃটিশ সার্বভৌমত্বের

---

১৯. Hertzel's memoirs, 1364-3.

২০. Do, 1370-2.

২১. মিসরে প্রেরিত হার্জেলের দূতের নাম। একজন বৃটিশ য়াহ্ূদী ও য়াহ্ূদী কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য।

অধীনে য়াহুদীরা উক্ত এলাকায় নিজেদের স্বায়ত্ব শাসিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবে। হার্জেল এই সময়কার দৈনন্দিন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে তাঁর স্মৃতিকথা থেকে কতগুলো উদ্ধৃতি পেশ করা হলো।

কায়রো ২রা এপ্রিল,
গতকালের আলোচনা নিস্ফল ছিল। আমি বলতে পারবো না এটা ভাল দিন ছিল না মন্দ দিন ছিল। আরিশ এলাকায় সুবিধা আদায়ের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং অনুমোদিত ছিল। কিন্তু জানি না এটা মিসরীয় সরকারের উপর কি প্রভাব ফেলবে।

আমি বিশ্বাস করি যে, May Ellopith-এর নিকট দেওয়া গ্রীনবার্গের পরিকল্পনার উপর আস্থা স্থাপন করে আমরা একটি ভুল করেছি। কেননা এখানে বিস্তারিত অনেক কিছু শামিল করা হয়েছে। অথচ আমার পরিকল্পনায় মাত্র কয়েকটি আলোচনা রয়েছে এবং সেখানে রয়েছে একটি অবিরোধীয় পরিকল্পনার সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ। মোট কথা আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

কায়রো ৩রা এপ্রিল,
গতকাল সন্ধার পরে আমি May Ellopith-এর সংগে দেখা করলাম তাঁর টেনিস স্যুট পরা অবস্থায়। কেননা তিনি তখন কেবলমাত্র 'জেবিরা স্পোর্টস ক্লাব' থেকে ফিরলেন। এই সাক্ষাতে তাঁকে পরিকল্পনার সফলতায় সন্দিগ্ধ মনে হলো। আমার ধারণা হলো যে, টারবুশ পরিহিত বৃটিশ ভদ্রলোক মিঃ ব্রিনিয়ান্ট তাঁর চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করেছেন। যাই হোক, (সাব্যস্ত হলো যে), পরিকল্পনাটি ক্যাবিনেটে আলোচিত হবে।

মূল আপত্তি হবে আমাদের দাবীকৃত এলাকাটির বৃদ্ধির ব্যাপারে। তারা আমাদেরকে কিছু ভূমি দিতে চান কিন্তু একটি এলাকা নয়।

১৯০৩ সালের বসন্তকালে য়াহুদী কমিশন আরিশ এলাকা থেকে কায়রো ফিরে এলো একটি আশাব্যাঞ্জক ফল নিয়ে। হার্জেল পরিপূর্ণ আশা নিয়েই আল-আরিশ ত্যাগ করেন। কেননা তিনি মিসরেও--বিশেষ করে আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাসরত বিত্তশালী য়াহুদীদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি-সমূহের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলেন।

গভর্নর লর্ড ক্রোমারের সংগে সাক্ষাতের জন্য একটা সময় নেওয়া হয়েছিল। হার্জেল তাঁর সংগে অত্যন্ত আশাবাদী ও খুশী মনে দেখা করলেন। এমন সময় হঠাৎ মিসরীয় সরকার ঘোষণা দিলেন যে, পুরা বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরক্ষণেই আর এক ঘোষণায় বলা হলো যে, য়াহুদীদের জন্য যে এলাকার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল সেটা একেবারেই শুষ্ক ও অনুর্বর এবং সেখানে নীলনদের পানি দ্বারা নিয়মিত সেচকার্য চালাতে হবে। অথচ নীলনদের প্রতিবিন্দু পানিই মিসরের জন্য অত্যন্ত জরুরী। য়াহুদী মিশন ব্যর্থ হলো। হার্জেল যেন বজ্রাহত হলেন।

এইভাবে সেই প্রথম দিন থেকেই সিনাই উপদ্বীপ ও আরিশ উপত্যকাকে কলোনী বানানোর পথে বিভিন্ন প্রকারের বাধা-বিঘ্ন প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডেভিড তেরাউশ লেখেন যে, "ব্যাপার খুবই সহজ। কেউ তার দেশ প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ-পূর্বাংশ শুধুমাত্র পানির অভাবে পরিত্যাগকরতে পারে না।"[২২]

এ কথা স্পষ্ট যে, য়াহুদীদের দ্বারা সিনাইকে কলোনী বানানোর ব্যর্থতার পিছনে প্রধান কারণ ছিল উক্ত এলাকায় নীলনদের পানি সরবরাহে অসুবিধা। যাই হোক, য়াহুদীরা তাই বলে সিনাই দখলের পরিকল্পনা ত্যাগ করেনি; বরং তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, মিসরীয় প্যালেস্টাইন (সিনাই) অবশ্যই বৃহত্তর প্যালেস্টাইনে--অন্যকথায় য়াহুদীদের স্বদেশ ভুমিতে পরিণত হবে।

১৯১৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা প্যালেস্টাইন সাময়িকীতে প্যালেস্টাইনের সীমানা সম্পর্কিত একটি নিবন্ধে য়াহুদীরা প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে সিনাই উপদ্বীপ এবং অন্যান্য সীমানা সম্পর্কে মিসরের সংগে পুনরায় আলোচনা শুরু করার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে।

১৯১৮ সালে উক্ত সাময়িকীতে বেন গুরিয়ান ও বেন জিভি লিখিত নিবন্ধে য়াহুদীদের স্বদেশ ভুমির সাথে আরিশ উপত্যকার সংযুক্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং বলা হয়, প্যালেস্টাইনের পূর্ব অংশ এর দক্ষিণ অংশ থেকে মোটেই ছোট নয় যা ৭৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা

২২. Rabinovitch, p. 75.

পরিব্যপ্ত। আমরা যদি এটাকে আল-আরিশের সংগে সংযুক্ত করি, তা হ'লে এর আয়তন দাঁড়াবে ৯০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।[২৩]

ইতিপূর্বে বর্ণিত স্বস্তি পরিষদের (Peace congress) নিকট পেশকৃত স্মারকলিপিতে য়াহূদীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, 'পূর্ব সীমানা অবশ্যই সরকারের স্বীকৃতি পাবে', সরকার অর্থাৎ যারা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ হিসেবে মিসরে আছেন।

য়াহূদীদের নিকট সিনাই উপদ্বীপ প্যালেস্টাইনের নিকটতম প্রস্তর ধাপ এবং তারা সিনাইকে তাদের ধর্মীয় পূর্বস্মৃতির গভীর অনুভূতির সংগে স্মরণ করে থাকে।

বস্তুতপক্ষে য়াহূদীরা ইসরাঈল রাষ্ট্রের সীমানা সুয়েজখালের পূর্ব তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করার ঈপ্সিত লক্ষ্য থেকে এক মুহূর্তের জন্য বিচ্যুত হয়নি। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনের উপরে আরোপিত বেলফোর ম্যাণ্ডেটের (৯৯ বৎসরের) সময়কালের মধ্যে তারা তাদের অবিরত প্রচেষ্টা জোরদার করে।

য়াহূদীরা সর্বদা অত্যন্ত সজাগ কিভাবে এক আরব রাষ্ট্রকে অপর আরব রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা যায় এবং যে কোন মূল্যে আরব ঐক্যে বাধা সৃষ্টি করে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়। য়াহূদীরা সিনাই উপদ্বীপ ও আল-আরিশ এলাকা দখলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং এই লক্ষ্য হাসিলের কোন প্রচেষ্টাই তারা বাদ দেয় না। যারা মাইনার তেশাজেনের (Meiner Teshangen) স্মৃতি-কথা পড়েছেন, তারা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।[২৪]

১৯৫৬ ও ১৯৬৭ সালে ইসরাঈলের উপর্যুপরি দুঃসাহসিক মিসর অভিযান সম্ভবত সময় ও সুযোগমত সিনাই ও আরিশ এলাকা দখলের পূর্ব-পরিকল্পিত নীলনক্শারই অংশ। '৬৭-এর যুদ্ধের পর ইসরাঈল 'শেরম আল-সেইখ' এলাকায় পর্যটন পরিকল্পনাসমূহ গড়ে তুলতে শুরু করে এবং সিনাই অঞ্চলে তেল অনুসন্ধানের চেষ্টা চালায়। সিনাইয়ের সেন্ট ক্যাথেরিন

২৩. Palestine Magazine, 3rd Vol. No. 17.
২৪. R. Menier Teshangan : Middle East Agenda, 1917—1956. London 1959.

মঠের আর্চ বিশপ তখন গীর্জাসমূহের নেতৃবৃন্দের কাছে এই বলে প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেন যে, 'এই পবিত্র মঠটি চঞ্চল সেনাবাহিনীর পদভারে কম্পিত গ্যারিসনে রূপান্তরিত হতে চলেছে। বিগত সপ্তদশ শতাব্দীকাল ধরে এই স্থানটি উপাসনাকারীদের পবিত্র তীর্থ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। অথচ এবারই প্রথম এটিকে অপবিত্র করা হচ্ছে। য়াহূদীরা মঠের নিকটেই দু'শো কামরার একটি হোটেল নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে—যা ভবিষ্যতে নাইট ক্লাবে পরিণত হবে। যেখানে তারা সারারাত মদ খেয়ে মাতলামি করবে আর দিনেরবেলা উলংগ হয়ে সূর্যস্নান করবে।'[২৫]

এটা ১৯৬৭ সালের দখলীকৃত এলাকা থেকে সরে না আসার ব্যাপারে ইসরাঈলের সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিজ্ঞার একটি চূড়ান্ত দলীল।

তবে মিসরে ইসরাঈলের আগ্রাসী লক্ষ্য আরো আগেকার। তাদের লক্ষ্য সুয়েজখাল দখল করা যাতে ওটাকে নিজেদের ও উপনিবেশিক শক্তিগুলোর স্বার্থে ব্যবহার করা যায় এবং যাতে উপনিবেশিক শক্তিসমূহ এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারে যে, তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে সুয়েজখালের উপর খবরদারির ব্যাপারে ভবিষ্যতে তাদের পথ উন্মুক্ত থাকবে। এর ফলে মিসর তার একটি বিরাট আয়ের উৎস থেকে বঞ্চিত হবে এবং যা এক-চেটিয়া ভোগ করবে উপনিবেশিক শক্তিগুলো। এ সব ছিল ১৯৫১ সালে সুয়েজখাল জাতীয়করণ করে নেওয়ার আগেকার ঘটনা।

ইসরাঈলের অন্যতম লক্ষ্য হলো ডেলটা ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করা—যাতে 'নীল থেকে ইউফ্রেটিস' পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ইসরাঈল রাষ্ট্রের ভবিষ্যত স্বপ্ন তাদের সফল হয়।

ইরাকে

লর্ড রথচাইল্ড নামক একজন য়াহূদী পুঁজিপতির নিকট আরিশ, সিনাই ও সাইপ্রাস দ্বীপ[২৬] য়াহূদী উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপনের ভবিষ্যত পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত নকশা হার্জেল একটি চিঠির মাধ্যমে ১৯০২ সালে প্রেরণ করেন।

---

২৫. Zionist expansion intentions P. 89—91.

২৬. ভূগোলে উল্লেখিত সাইপ্রাস দেশ নয়। বিস্তারিত দেখুন Laxicon of the countries, P. 7-26.

২—

য়াহুদী নেতা হার্জেল উক্ত চিঠিতে এ বিষয়ে খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, য়াহুদী বসতি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় তীরবর্তী ঐ এলাকায় য়াহুদী কলোনী স্থাপন তাদেরকে প্যালেস্টাইনে খুঁটি গাড়তে উৎসাহিত করবে।

এই সংগে হার্জেল সর্বপ্রথম দ্ব্যর্থহীনভাবে ইরাকে কলোনী স্থাপনের একটি গোপন পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন।

উল্লেখ্য যে, ইরাকে কলোনী স্থাপনের উক্ত পরিকল্পনা হঠাৎ করে পেশ করা হয়নি। ১৯০৩ সালের ৪ঠা জুন তারিখে তৎকালীন উসমানীয় খিলাফতের অধীনে মিসরের প্রধান মন্ত্রী ইয়ুযত পাশার নিকটে হার্জেল কর্তৃক লিখিত একটি পত্রে ইরাকে ও একর (Acre) জেলাতে য়াহুদী কলোনী স্থাপনের অনুমতি দান ও এ ব্যাপারে কোনরূপ বাধা না দেওয়ার বিষয়ে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।[২৭]

ইরাকে য়াহুদী আগ্রাসী লক্ষ্য শুরু হয় আন্তর্জাতিক য়াহুদী সংস্থা গঠনের ঊষালগ্ন থেকেই। সূচনাকাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত, যে সময়ে ইরাকের অধিকাংশ য়াহুদী অধিবাসী অধিকৃত প্যালেস্টাইনে হিজরত করে, য়াহুদীরা সে সময়ে একটি বড় ধরনের প্রচেষ্টা নেয় এবং দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য বিরাট অংকের টাকা ব্যয় করে। তারা সৌধ নির্মাণের জন্য বহু শহরে জমি ও কৃষিকাজের জন্য বহু কৃষি জমি ক্রয় করে। তাদের এই অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারলাভ করে দীওয়ানীর পাহাড়িয়া 'ডেহক', 'নাছিরা' ও 'আমারা' এলাকায়—যেখানে তারা সর্বাপেক্ষা উর্বর ভূমি ক্রয় করে।

তারা খোদ বাগদাদেও বিরাট এলাকা কিনে নেয়। বিশেষ করে কার-রাদার (Kerreda) পূর্ব উপকণ্ঠে। তবে সুখের বিষয়, আযমেই (Azmieh) এলাকার বাসিন্দারা য়াহুদীদের গোপন দুরভিসন্ধি বুঝতে পারে এবং তাদের নিকট জমি বিক্রির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৪৮ সালে য়াহুদীরা ইরাক ছেড়ে চলে আসার সময় প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিল এই বলে যে, "সে দিন অচিরেই আসবে, যে দিন আমরা পুনরায়

২৭. Hertzel's memoirs P. 1503-4.

ইরাকে ফিরে আসবো এবং আমাদের ভূমি ও সম্পত্তির উপর দাবী পেশ করবো।"

য়াহূদীদের সম্প্রসারণবাদী তৎপরতা শুধু মাত্র নীল ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং টাইগ্রীস নদীর এলাকাসহ সমগ্র ইরাককে কলোনী বানানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকবে—যাতে তাদের সীমানা উত্তর ও পূর্ব ইরাকে যথাক্রমে তুর্কী ও ইরানী সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হ'তে পারে। ১৯৬৭-এর ৬ই জুন জেরুজালেম দখলের দিন (তৎকালীন ইসরাঈলী প্রধান মন্ত্রী) মোশেদায়ান ঘোষণা করেন, "আমরা জেরুজালেম অধিকার করেছি এবং এখন ইয়াস্রেব (মদীনা) ও বাবেল দখলের পথে রয়েছি।"

সউদী আরব ও আরব উপসাগরে

য়াহূদীরা সর্বদা আকাবা উপসাগর তীরবর্তী সউদী ভূমিসমূহ দখলের আশা পোষণ করে—যাতে পূর্ব সীমান্তে ৯৫ মাইল দীর্ঘ একটি নিরাপদ বাউণ্ডারী সৃষ্টি হয়। ইসরাঈল আকাবা উপসাগরকে একটি হ্রদে পরিণত করতে চায় যা লোহিত সাগর এবং প্রাচ্যের আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশ-সমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করবে।

ইসরাঈল তার প্রভাব বলয় দক্ষিণে বহু দূরবর্তী মদীনা শরীফ পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চায় এই অজুহাতে যে, এই অঞ্চলসমূহ এককালে তাদেরই ছিল এবং সেখান থেকে মুহাম্মাদ (স.) তাদেরকে বের করে দিয়েছিলেন।

তারা আরও উচ্চ আশা পোষণ করেন যে, তাদের সীমানা বর্ধিত হবে মদীনা শরীফ থেকে ১১২ মাইল দক্ষিণে 'ইয়াম্বা' (Yamba) বন্দর পর্যন্ত এবং নজদের তৈলকূপ এলাকা পর্যন্ত। এর পিছনে তারা এই উদ্ভট দাবী পেশ করে যে, আরবদের তুলনায় তারাই তেল সম্পদের ব্যবস্থাপনায় অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী।

য়াহূদীরা আরব সাগর তীরবর্তী আমীর শাসিত ও শেখ শাসিত এলাকা-সমূহ নিজ অধিকারে আনতে চায় যাতে এই এলাকার তেল খনিগুলোকে কাজে লাগানো যায় এবং ভারত ও দূরপ্রাচ্যের এশীয় দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র হিসেবে এই এলাকাকে ব্যবহার করা যায়।

১৯৬৭ সালে ৬ই জুন জেরুজালেম দখলের পর মোশেদায়ান ঘোষণা করেছিলেন যে, মক্কা-মদীনা দখলের পথ এখন আমাদের জন্য উন্মুক্ত।

আরব দেশসমূহে ইসরাঈলের সম্প্রসারণবাদী লালসার কোন শেষ নেই। তারা দাবী করে যে, আরব দেশসমূহের অগাধ সম্পদ ভোগ করার নায্য হকদার তারাই। কেননা তারাই এ সব দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা বহন করে এনেছে এবং তারাই আরবদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল কারণ।

য়াহূদীদের আগ্রাসী লক্ষ্যসমূহের পেছনে উদ্দেশ্য

য়াহূদীদের আগ্রাসী লক্ষ্যসমূহের পিছনে মূল উদ্দেশ্যসমূহকে চারভাগে সাজানো যেতে পারে। যথা: (১) মতবাদগত, (২) সামরিক, (৩) অর্থনৈতিক এবং (৪) রাজনৈতিক।

১. মতবাদগত কারণ

য়াহূদী সম্প্রসারণবাদী প্রেরণা সরাসরি ভিত্তিলাভ করেছে তাদের ধর্মীয় আকীদা থেকে---যার উপরে ভিত্তি করে য়াহূদী মতবাদ অগ্রগতি সাধন করেছে। বিশ্বের অন্য সকল এলাকা বাদ দিয়ে প্যালেস্টাইনকেই তাদের 'জাতীয় ভূমি' হিসেবে নির্বাচন করার মূলেও এই ধর্মীয় কারণ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

১৮৯৭ সালে প্রথম য়াহূদী কংগ্রেসে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে হার্জেল বলেন যে, য়াহূদীরা তাদের নিজস্ব ভূমিতে ফিরে যাবার আগে তাদের য়াহূদী মন্দিরে গমন করবে। The Jewish state (য়াহূদী রাষ্ট্র) শিরোনামে একটি প্যাম্ফলেটে হার্জেল লেখেন, Faith unifies us—অর্থাৎ একই ধর্মগত বিশ্বাস আমাদিগকে একীভূত করছে।[২৮] তিনি আরও লেখেন যে, আমি আমার সন্তানদেরেকে 'ঐতিহাসিক খোদা' (Historical God) বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তিনি বলেন, খোদা আমাদেরকে কখনোই পিছনে রেখে আসা যুগে ফেলে রাখবেন না। তিনি কি আমাদের ভাগ্যে মানব ইতিহাসে কোনরূপ ভূমিকা পালনের সুযোগ রাখেন নি?[২৯]

---

২৮. Theoder Hertzel, the jewish state: An attempt at a modern solution of the Jewis question. Translated by sylvic D. Avigdor 4th edition (London 1946) P.54 and P.71.

২৯. পূর্বোক্ত, ৫৪৭।

ইসরাঈলে বর্তমানে কয়েকটি শক্তিশালী ধর্মীয় পার্টি রয়েছে। যেমন মিযরাহী (Mzrahi) পার্টি, লেবার মিযরাহী পার্টি, এগোডার্ট পার্টি ও লেবার এগোডার্ট পার্টি।

মিযরাহী পার্টির মূলনীতি থেকে একটি উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া অবশ্যই আমাদের স্বর্গীয় ঐতিহ্যগত সম্পদ অনুযায়ী হ'তে হবে। আমাদের আইন অবশ্যই য়াহূদী ধর্মীয় বিধানের উপর ভিত্তিশীল হ'তে হবে। আমাদের প্রধান পুরোহিত অবশ্যই এমন মর্যাদা সংরক্ষণ করবেন, যা সংগতিপূর্ণ হবে বিভিন্ন দেশের সেরা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাদের প্রাপ্ত উচ্চ মর্যাদার সংগে। এছাড়া শনিবার অবশ্যই তাদের ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হবে।

ইসরাঈলী এগোডার্ট পার্টির মূলনীতি থেকে একটি উদ্ধৃতি নিম্নরূপ :

ইসরাঈলী জনগণ সৃষ্টিলাভ করেছে সিনাই পাহাড়ে, যেখানে তারা তওরাত (The Bible) লাভ করে। য়াহূদী রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে কখনোই সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না সে তওরাতের মূল উদ্ধৃতিসমূহ ঠিক মত পালন করে চলবে। এবং সে কোনক্রমেই তার সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সক্ষম হবে না একমাত্র তওরাতের মাধ্যম ছাড়া। সকল প্রকারের শিক্ষাসূচী অবশ্য তওরাতের দেওয়া নকশা অনুযায়ী হ'তে হ'বে। য়াহূদী জনগণ অবশ্যই দৃঢ় ভাবে পালন করবে তাদের যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠান, শনিবারের ছুটি এবং উৎসব অনুষ্ঠানসমূহ। তাদেরকে অবশ্যই য়াহূদী জীবনের অকৃত্রিমতা বজায় রাখতে হবে। যাবতীয় নাগরিক আইন অবশ্যই ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং সমস্ত প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্ব অবশ্যই পুরোহিতদের হাতে থাকবে।

এগোডার্ট ইসরাঈল লেবার পার্টির মূলনীতির কিছু উদ্ধৃতি নিম্নরূপ :

ইসরাঈল অন্যান্য দেশের মত একটি দেশ নয়। তওরাতের (The Bible) অনন্তকালের জন্য প্রদত্ত বিধানসমূহই ইসরাঈলী জনগণের ও রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সংবিধান (natural constitution)। পবিত্র তওরাতের বিধান ব্যতীত অন্য কোন আইন ও বিধান আমাদের প্রণীত আইন-সমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। জনগণ এবং রাষ্ট্র মিলে একটি পরিবারের ন্যায়। ইসরাঈলের এই পরিবারকে ধ্বংসের

হাত থেকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না কেবলমাত্র তওরাতের নীতি-নির্দেশ ও আইনসমূহ পালন করা ছাড়া। বিশ্বশান্তি বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন—যদিও সেনাবাহিনীর প্রভাব দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হবে না ; বরং সেনাবাহিনী অবশ্য অবশ্যই পরিচালিত হবে ইসরাঈলের মৌলিক মানসিক দৃষ্টিভংগী দ্বারা—যা খোদায়ী শক্তিদ্বারা উন্নতিলাভ করে, কোন অস্ত্রের শক্তি দ্বারা নয়।

সর্বশেষে মিযরাহী লেবার পার্টির কিছু মূলনীতির উদ্ধৃতি পেশ করা যাচ্ছে ঃ

যেমন পবিত্র তওরাত (The Bible) অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত করবে রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন-কানুনকে অবশ্যই তওরাতের উপর ভিত্তিশীল হতে হ'বে।

১৯৭০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পম্পিডু ইসরাঈল সম্পর্কে বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলের একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। কিন্তু যদি সে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় রাষ্ট্র না হয়ে অন্যান্য সাধারণ রাষ্ট্রগুলোর মত হতো, তা হ'লে প্রতিবেশীদের সংগে তার সম্পর্কের উন্নতি হতো।

এই সময় আন্তর্জাতিক য়াহূদীবাদ ধর্মের প্রতি খুবই আগ্রহ দেখায়। অন্যদিকে অন্যান্য দেশে অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ যোগায়—যাতে ঐসব সরকারের নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়।

য়াহূদী আন্দোলন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দু'টি মৌলিক দাবীর উপরে জোর দেয়, যা তারা কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করতে পারে না।

১. নীল থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় তাদের ভাষায় The Promised land or the land of Israel অর্থাৎ প্রতিশ্রুত ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

২. য়াহূদী জনগণকে তাদের জাতীয় ভূমিতে ফিরে আসা। কেননা প্যালেস্টাইনের বাইরে নির্বাসন জীবন যাপন করা য়াহূদী জনগণের ধর্ম বিশ্বাস ঐ স্বাভাবিক জীবন ধারার বিরোধী। য়াহূদী ইতিহাসের সকল পর্যায়ে তাদের অঘোষিত লক্ষ্য ও পথ নির্দেশক নীতি সর্বদাই ছিল ঃ

স্বীয় লক্ষ্যচ্যুত না হয়ে যা পারো করে যাও। তোমার নগদ ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় যে কোন বস্তুর সুযোগ লও।

য়াহূদীবাদ সব সময় নীল থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইন প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছে এবং তাদের নিজস্ব ভূমিতে য়াহূদীদের অধিকার বজায় রাখতে চেয়েছে। যদিও তাদের এই 'ন্যায্য অধিকারের' দাবী কালের আবর্তনে সাময়িকভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

'হেরট' (Hirout) পার্টির নেতা ও (বর্তমান ইসরাঈলী প্রধান মন্ত্রী) প্রখ্যাত য়াহূদী সন্ত্রাসবাদী মেনাহিম বেগিন (The revolt or) বিদ্রোহ নামক স্বীয় বইয়ে লেখন, তওরাতের অবতরণকাল থেকেই প্যালেস্টাইন ভূমি ইসরাঈলের সন্তানদের জন্যই নির্দিষ্ট—যা পরবর্তীকালে প্যালেস্টাইন নামে অভিহিত হয়েছে এবং এটা সবসময় জর্ডান নদীর দুই-তীরকে অন্তর্ভুক্ত করে। সেজন্য প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করা অন্যায় এবং সে অবস্থায় তা কখনোই আইনগত স্বীকৃতি পেতে পারে না। এর বিভক্তির চুক্তিতে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষর থাকলেও তা কখনোই আইন সম্মত হবে না; বরং ইসরাঈলী ভূমি সম্পূর্ণভাবে এবং চিরকালের জন্য ইসরাঈলী জনগণের অধিকারেই ফিরে আসবে।[৩০]

১৯৫০ সালের ৭ই এপ্রিল মেনাহিম বেগিন বলেন যে, আমরা কোন শান্তিচুক্তি করি বা না করি, যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করতে না পারবো ততদিন পর্যন্ত আরব বা ইসরাঈলী জনগণের জন্য কোন শান্তি আসতে পারে না।[৩১]

১৯৫৭ সালের ১৬ই আগস্ট ২৩তম য়াহূদী সম্মেলনে আমেরিকান য়াহূদী নেতা আবা হিলেল সিলভার (Abba Hille Silver) বলেন যে, ইসরাঈল রাষ্ট্র এখনো ছোট ও অমীমাংসিত (unsettled) অতএব আমাদেরকে এর মুকাবিলায় সকল সমস্যার সমাধান করা উচিত।[৩২]

১৯৫১ সালের ৮ই আগস্টের য়াহূদী সম্মেলনে ইসরাঈল সরকারের পক্ষ থেকে এক বক্তৃতায় ধর্মমন্ত্রী রাব্বী য়াহূদা মায়মুন বলেন যে,

---

৩০. Menahim Begin : The Revolt, London 1950, p. 335.
৩১. Israil an economic, military and political danger. Beirut, p. 31.
৩২. Ibid. P. 12.

আপনাদের এই সম্মেলন বিরাট গুরুত্বের সংগে ঐ সব সমস্যা বিবেচনা করবে, যে গুলো পূর্ণাংগ ইসরাঈল রাষ্ট্র সম্পর্কিত—যা বিস্তৃত হবে ইউফ্রেটিস থেকে নীলনদ পর্যন্ত।[৩৩]

১৯৪৮-এর যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই বেন গুরিয়ান বলেন, যে তরবারী আজ খাপের মধ্যে ফিরে এসেছে, তা অত্যন্ত অস্থায়ীভাবে এসেছে। আমরা একে আবার বিস্তারিত করবো যখন আমাদের স্বাধীনতা আশংকা-গ্রস্থ হবে অথবা যখন তওরাতের নবীদের স্বপ্ন বিপদগ্রস্থ হবে। সকল য়াহূদী জনগণ তাদের পিতৃপুরুষদের ভূমিতে বসতি স্থাপনের জন্য অবশ্যই ফিরে আসবে—যা নীল থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

১৯৫০—৫১ সালে ইসরাঈলের বার্ষিক সরকারী রিপোর্টের ভূমিকায় বেন গুরিয়ান বলেন, আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে কোন বড় একটা দেশ লাভ করিনি; বরং দীর্ঘ ৭০ বৎসরের কঠিন সংগ্রামের পর আমরা আমাদের ছোট দেশটির স্বাধীনতার প্রাথমিক পর্যায়ে পেঁাছেছে মাত্র।[৩৪]

১৯৫২ সালের ইসরাঈলী সরকারী বইয়ের ভূমিকায় বেন গুরিয়ান ইসরাঈলের সম্প্রসারণবাদী নীতিকে নিম্নোক্ত ভাষায় নিশ্চয়তা দিচ্ছেন ঃ

> প্রত্যেকটি দেশই একটা নির্দিষ্ট ভূমি ও জনগণ নিয়ে গঠিত। ইসরাঈলও এই নীতির ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এই রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছে তার ভূমির সংগে অসংগতিপূর্ণ অবস্থায়। যখন আমাদের রাষ্ট্র গঠিত হয় তখন পূর্ণ ইসরাঈলী ভূমির মাত্র একটি অংশে তা স্থাপিত হয়—যা সর্বমোট য়াহূদী জনসংখ্যার মাত্র ০৬% শতাংশ ধারণ করতে সমর্থ হয়।[৩৫]

প্রতিবেশী আরব দেশসমূহের উপর সম্প্রসারণবাদী থাবা বিস্তারের উদ্ধত অংগীকার য়াহূদী নেতা ও রাজনৈতিক দলগুলোকে ছাড়িয়ে খোদ ইসরাঈলী সরকারের মুখেও শোনা যায়। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত ইসরাঈলের সরকারী বইয়ে বলা হয় যে, একটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি দ্বারা কোনক্রমেই ইসরাঈলের প্রাকৃতিক সীমানা-কাঠামোকে ধ্বংস করতে দেওয়া যায় না।[৩৬]

---

৩৩. Ibid. P. 31
৩৪. Ben Geriou's speech of 7th June, 1949.
৩৫. Introduction to the annual book of the Israeli Govt. for the year 1952. P. 15.
৩৬. Annual book of the Israeli Govt. for the year 1944. P. 230.

১৯৫৬ সালে মিসরের উপরে ত্রয়ী হামলার মাত্র ৯ দিন পরে বেন গুরিয়ান ইসরাঈলী পার্লামেন্টে সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, ইসরাঈলী প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুঃসাহসিক আক্রমণ আমাদের স্বদেশ ভূমি ও সিনাই পাহাড়ের সংগে বন্ধনকে নবায়ন করলো।[৩৭]

বেন গুরিয়ান বিগত ২০ বৎসর যাবত পুনঃ পুনঃ এ কথার উল্লেখ করেন যে, জেরুজালেম ছাড়া ইসরাঈলের কোন অর্থ হয় না এবং ধর্মমন্দির (Temple) ছাড়া জেরুজালেমের কোন অর্থ হয় না।[৩৮] বেন গুরিয়ান এখানে ধর্মমন্দির অর্থে কি বুঝিয়েছেন ? নিশ্চয় তা বায়তুল আকসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসরাঈলী স্কুলসমূহে ভূগোলের একটি পাঠ্য বইয়ে লেখা হয়েছে ঃ

১৯৪৯ সালের শান্তি আলোচনায়[৩৯] ইসরাঈলী প্রতিনিধি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ইসরাঈল ও এর প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বজায় রাখবার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পার্টিশন স্কীমের ভিত্তিতে যে মীমাংসা নির্ধারণ করা হয়, আরব আগ্রাসনের ফলে ঐ সীমানা বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়।[৪০]

আবা ইবান বলেন যে, আমরা সর্বদা আমাদের পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবো জর্ডান এবং এর পানির উৎসগুলোর দিকে।[৪১]

উপরের ঘোষণাসমূহ এ কথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ইসরাঈলের উন্নতি, এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বণ্টন, এর কৃষি-শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি—সব

---

৩৭. Jerusalem post newspaper, Nov. 8, 1956.

৩৮. ইসরাঈলের প্রধান রাজনৈতিক দল লেবার পার্টি ১৯৬৯ সালের ৫ই আগস্টে সমাপ্ত সপ্তাহব্যাপী নির্বাচনী অভিযানে নিশ্চয়তা দেয় যে, তারা কখনোই জেরুজালেম, গাযা, গোলান মালভূমি, সিনাই এলাকা ও জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর থেকে হটে আসবে না। তারা জর্ডান নদীকে ইসরাঈলের জন্য নিরাপদ পূর্ব সীমানা বলে মনে করে।

৩৯. ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপ রোড্‌স-এ এই শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলশ্রুতি হিসেবে আরব ভূমির বহু এলাকা—যা ইতিপূর্বে ইসরাঈলীদের অধিকারে ছিল না— তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো জেনিন জেলার একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড।

৪০. Jerusalem post Issue of 2-5-1951.

৪১. Jerusalem post newspaper Issue, dated 10.7.51.

কিছুই তার সরকারের উপর দায়িত্ব আরোপ করছে। জর্ডান নদীর পানি এবং লেবানন, সিরিয়া ও জর্ডানের অন্যান্য পানির উৎসসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের নাজার মরুভূমিকে কাজে লাগানোর জন্য ১৯৬৭-এর যুদ্ধে ইসরাঈলী সেনাবাহিনী সিরিয়া ও জর্ডানের কতকগুলো পানির উৎসের উপর দখল কায়েম করতে সমর্থ হয়।

যাই হোক, য়াহূদী আগ্রাসন ও সম্প্রসারণবাদের পিছনে পানিই একমাত্র অর্থনৈতিক লক্ষ্য নয়; বরং ইসরাঈলের ব্যবসায় সমস্যা, ইসরাঈলী উৎপাদন সমূহের বাজার সৃষ্টি এবং আরবদের অর্থনৈতিক অবরোধ ভেংগে দেওয়া ও পানির উৎসসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণলাভের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১৯৫১ সালে দেওয়া এক বক্তৃতায় বেন গুরিয়ান ঘোষণা করেন, 'আমরা অবশ্যই ইলিয়ট বন্দর প্রতিষ্ঠা করবো এবং ভারত মহাসাগরে নৌ-যোগাযোগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবো। আমরা তা সম্পাদন করবো আমাদের আকাশ, নৌ ও স্থল বাহিনীর সাহায্যে।[৪২]

বেন গুরিয়ান উপরিউক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা চালান ১৯৫৬ সালে সিনাই ও গাজা সেক্টরে ত্রয়ী হামলা চালানোর সময়। বেন গুরিয়ানের ভাষায় উক্ত হামলার পিছনে তিনটি উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল:

১. সিনাই উপদ্বীপে শত্রুশক্তি ভেংগে দেওয়া।
২. পূর্ব পুরুষদের ভূমি উদ্ধার করা—যা বিদেশী অধিকারে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে।
৩. আকাবা উপসাগর ও সুয়েজ খালের নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।[৪৩]

১৯৬৭ সালের মে মাসে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র যখন আকাবা উপসাগরে ইসরাঈলী জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করেন তখন ইসরাঈল আরব দেশসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে এবং জোর করে আকাবা উপসাগরে তার জাহাজ চলাচল পুনরায় চালু করে। কারণ এই নৌ-চলাচলের স্বাধীনতাকে ইসরাঈল তার অর্থনীতির জন্য জীবন রক্ষাকারী হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

---

৪২. Ephrain Orny Walisha Ephrai (Geography of Israel): translated into English by the Israeli office for scientific translations, Jerusalem, 1964. P. 170.

৪৩. Jerusalem post newspaper. Issue dated 9.11.56.

আকাবা উপসাগরে জাহাজ চলাচল বন্ধ করা হলে ইসরাঈল বঞ্চিত হবে পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহ ও অস্ট্রেলিয়ার সংগে তার বিরাট ব্যবসা থেকে।[৪৪]

যারা ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগের ও পরের য়াহূদীদের প্রধান ও নবীন নেতাদের লেখা পড়েছেন, তারা অবশ্যই উপলব্ধি করেছেন যে, এই নেতাদের ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অবিরত প্রচেষ্টা ও তা রক্ষার জন্য বিরামহীন সামরিক প্রস্তুতির পিছনে মূখ্য কারণ হিসেবে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণই ক্রিয়াশীল রয়েছে।

ইসরাঈলী সরকার ও লেখকগণ বিশ্ব য়াহূদী সম্প্রদায়ের প্রতি নব প্রতিষ্ঠিত ইসরাঈল রাষ্ট্রে হিজরত করার জন্য উৎসাহিত করেন ও আহ্বান জানান এবং সেখানে অর্থনৈতিক স্বার্থকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারা তাদেরকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন—যা তাদেরকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ এনে দেবে। য়াহূদী নেতারা একই সুরে বার বার একই কথা উচ্চারণ করতে থাকেন। কোন বস্তুই তাদেরকে এই ধরনের কথাবার্তা থেকে একবিন্দু নড়াতে পারে না।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধশেষে শান্তিচুক্তির সময় তাদের দেওয়া দফাগুলোতে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ প্রথম সারিতে স্থান পায়। এই দফাগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১. আকাবা উপসাগরে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা এবং এই স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সাগর তীরবর্তী সিনাই মরুভূমির পশ্চিম অংশ ও শারম আল-শায়খের উপর য়াহূদী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

২. সুয়েজখালে জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা।

৩. জর্ডান নদীর উৎসসমূহের উপর য়াহূদী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

৪. আরব অর্থনৈতিক বয়কটের সমাপ্তি টানা।

আরবরা দ্ব্যর্থহীনভাবে এইসব দফা প্রত্যাখ্যান করে। কেননা এইসব প্রস্তাব মেনে নেওয়া অর্থ পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা।

---

৪৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, "Days prior to the decisive battles and after it", Beirut 1967, P.34-42.

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, অর্থনৈতিক তাগিদেই ইসরাঈল আরব দেশসমূহে বার বার আগ্রাসন চালায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই তাগিদই ইসরাঈলী সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।[৪৫]

২. সামরিক কারণ

এটা মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, ইসরাঈল তার সমস্যার সামরিক দিকটির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। কেননা ইসরাঈলের আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্য রয়েছে (এবং তারা ভাল করেই জানে যে), আরবরা তাদের ভূমি, মর্যাদা ও সম্প্রদায়ের পক্ষে অবশ্যই মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং তারা অবশ্যই তাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অধিকৃত আরব ভূমি ফিরে পাবে।

ইসরাঈলী সীমানাসমূহের প্রকৃতি, অধিকৃত ভূমির আয়তন, জনসংখ্যা বণ্টন, পূর্ব পুরুষদের ভূমি পুনঃ দখলের জন্য ইসরাঈলের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং শত্রুভাবাপন্ন আরব দেশগুলোর মাঝখানে অন্যায়ভাবে আরব ভূমি দখল করে রাখা প্রভৃতি কারণে ইসরাঈল সামরিক বিষয়টিকে অন্যতম অপরিহার্য বিষয় বলে মনে করে।

ইসরাঈলের সামরিক নীতি-কৌশলের সমালোচনা করার অপরাধে আদালতে জনৈক ইসরাঈলী লেখকের বিচার হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে উক্ত গ্রন্থকার আদালতকে বলেন ঃ

> আমি দেখেছি যে, রাষ্ট্র একদল অত্যন্ত গোঁড়া ধর্মান্ধ যুবদল সৃষ্টি করার জন্য তার পূর্ণ প্রচেষ্টা জোরদার করেছে; যারা সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করবে এবং অবশেষে নিজেদেরকে সরাসরি যুদ্ধ এবং আগ্রাসী লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রতি নিয়োজিত করবে। এই সংকীর্ণ ও গোঁড়া সামরিক শিক্ষা, যা তারা লাভ করেছে, মোটেই পৃথক নয় ঐ সমস্ত শিক্ষা থেকে—যা দেশে দেশে সামরিক শাসনের অধীনে দেওয়া হয়ে থাকে। জাপানী ও নাৎসীদের ন্যায় এরাও একটি বিশেষ আদর্শে সৈন্যদের গড়ে তুলবার মানসে দেশের যুব সমাজকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করছে। এমনকি তারা ছোট শিশুদেরকেও সামরিক

৪৫. See details in 'Israel's Militarian', Beirut, 1968, p. 63-65.

বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে কসুর করছে না। তারা সামরিক চেতনায় দেশের সবকিছুতেই ছাপ রাখতে চায়, যে ছাপ তারা মারতে চায়, সে ছাপ হলো আক্রমণ-অভিযানের এবং কলোনী স্থাপনের।[৪৬]

যাবতীয় বস্তুগত ও নৈতিক সম্ভাবনাসহ সমস্ত ইসরাঈলকে একটি বিরাট সৈন্য শিবির বলা যায়। কোন য়াহুদী ছেলে ১২ বৎসর বয়সে পা দিলেই তার নিয়মিত সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যায়। ১৮ বৎসর পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ চলে। তারপর তাকে নিয়মিত বাহিনীতে যোগ দিতে হয় একটি বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ সময়কাল শেষ করবার জন্য। প্রশিক্ষণ শেষে উক্ত সৈনিক সেনাবাহিনীর রিজার্ভ সেকশনের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সে তার ৩৯ বৎসর বয়সের পূর্বে প্রয়োজনমত যে কোন সময়ে যে কোন সামরিক কাজে নিয়োজিত হ'তে বাধ্য থাকবে। ৩৯ বৎসরের পরে সে বিভিন্ন কলোনীতে ন্যাশনাল গার্ড সার্ভিসে যোগ দেবে এবং যতদিন পর্যন্ত সে অস্ত্রবহনের ক্ষমতা রাখবে ততদিন সে উক্ত চাকুরীতে বহাল থাকবে। এইভাবে ইসরাঈলে সামরিক চাকুরী শুরু হয় শিশুকাল থেকেই এবং তা শেষ হয় তার মৃত্যুর পরে।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাঈল তার মোট জনসংখ্যার ১১% শতাংশকে সক্রিয় সামরিক কাজে লাগাতে সমর্থ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নিয়মিত সেনাবাহিনীর বাইরে অস্ত্র বহন ক্ষম প্রতিটি ইসরাঈলীকে দেশ রক্ষার জন্য রিক্রুট করা হয়।

অন্যদিকে আরবরা মাত্র ৩,০০০ সৈন্য এদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পেরেছিল।

ইসরাঈল তার সমস্ত নৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অথচ আরবরা কি করেছিল? ইসরাঈলের এই সামরিক কারণের পশ্চাতে উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) **নৈতিক সমর্থন ঃ** ইসরাঈল সর্বদা তার যুদ্ধরত সেনাবাহিনী ও জনগণের মনোবল উঁচু রাখতে চায়। অন্যদিকে সে আরবশক্তি ও আরব জনগণকে ধ্বংস করতে চায়।[৪৭]

---

৪৬. In the Tel-Aviv court on 19.4.1951. See the book entitled 'The road to victory in the Battle of revenge,' p. 128.

৪৭. The Arab Military unity, Beirut 1969, P. 132.

একটি উচ্চ মনোবলসম্পন্ন সেনাবাহিনী যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করে। ইসরাঈলী সেনাবাহিনীকে তার পরিচালনা, সংগঠন, অস্ত্রসজ্জা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে বস্তুগতভাবে এবং য়াহূদী ধর্মের আইন-কানুন ও নীতি-শিক্ষাসমূহ গভীরভাবে অনুধাবন ও য়াহূদী উত্তরাধিকার ও হিব্রূ ভাষার প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শনের আহ্বানের মাধ্যমে নৈতিকভাবে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়। শুধু সেনাবাহিনী নয়, বরং ইসরাঈল ও ইসরাঈলের বাইরে বিশ্বের সকল প্রান্তের য়াহূদী জনগোষ্ঠীর মনোবল এর দ্বারা উন্নত হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে বহু বৎসরের অপমান ও নিগ্রহ ভোগের প্রেক্ষাপটে ইসরাঈল বা য়াহূদীরা এখন সবচাইতে প্রয়োজন উপলব্ধি করছে তাদের নৈতিক উন্নতির।

য়াহূদীরা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। তারা মিথ্যা প্রতিমাসমূহের পূজা করতো[৪৮] এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারা অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়ে অন্যের উপর অত্যাচার করতো এবং তাদের নিজেদের গোত্রীয় নবীদেরকে অন্যায় ভাবে হত্যা করেছিল। আল্লাহ্ তাদের শত্রুদের তাদের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেন এবং আসীরিয়রা খৃ. পূ. ৭২১ সালে ইসরাঈলের রাজত্বকে ও ব্যবিলনীয়রা খৃ. পূ. ৫৮৭ সালে য়াহূদার রাজত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাদের ধর্মমন্দির বিধ্বস্ত হয় এবং জীবিত সকলেই বন্দী হয়। য়াহূদীরা বন্দী জীবনে দারুণ নির্যাতন ভোগ করে যতদিন না ফরাসীরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তাদের মধ্যে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে খৃ. পূ. ৫৩৮ সালে জেরুজালেমে প্রত্যবসিত করে।

য়াহূদীরা তাদের বিগত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ কিংবা তাদের নবীদের হুশিয়ারী ও উপদেশসমূহের প্রতি কোনরূপ মনোযোগ দেয় বলে মনে হয় না। রোমকরা তাদেরকে দু'বার পর্যুদস্ত করেছে।

একবার খৃ. পূ. ৭০ সালে সম্রাট তিতাস ফ্লাভিয়াসের আমলে যিনি জেরুজালেম নগরীকে ধ্বংস করেন এবং এর উপসনালয়কে জ্বালিয়ে দেন। দ্বিতীয়বার খৃ পূ. ১৩৫ সালে সম্রাট ইলিয়াস হাদিয়ানুসের হাতে, যিনি জেরুজালেম নগরীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং মহান ইলিয়ার

৪৮. তারা সিডনীদের (Sidonites) দেবতা 'আস্তারাউত' (Ashtarout) এবং এমোনিয়দের (Anomites) দেবতা 'ম্যালকমের' (Malcom) পূজা করতো। দেখুন Kings 18th 11 : 6 and 23

নামানুসারে এর নাম রাখেন 'ইলিয়া কাপিতুলুনা' (Elia Kapituluna) । তিনি এই নগরীর বাসিন্দাকে উৎখাত করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেন।

খৃস্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীতে রোমানরা যখন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলো তখন তাদের প্রভু যীশুর সাথে (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ হিসেবে তারা য়াহ্‌দীদের উপরে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। জেরুজালেম নগরীতে য়াহ্‌দীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো এবং শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সমস্ত ময়লা-আবর্জনা উপাসনালয়ের পাশে স্তূপীকৃত করা হলো।

৬৩৮ খৃস্টাব্দে ১৭ হিজরীতে মুসলমানগণ এই পবিত্র নগরী অধিকার করেন এবং য়াহ্‌দীদের জন্য একটি নবজীবনের সূত্রপাত ঘটে—যে জীবন মর্যাদার এবং সম্মানের ; যা তারা ইতিপূর্বে কখনোই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

মুসলিম খলীফা হযরত ওমর (রা.) ইসরাঈলী সন্তানদের বিরোধিতায় রোমানদের দ্বারা স্তূপীকৃত ময়লা-আবর্জনাসমূহকে উপাসনালয়ের উপর থেকে নিজহাতে অপসারণ করেন। তিনি তাঁর ঢিলা বড় জামা বিছিয়ে তাই দিয়ে আবর্জনা মুছতে থাকেন এবং মুসলমানদের এ কাজে সহায়তার জন্য আহ্বান করেন।[৪৯]

মুসলমানগণ তখন তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নবীদের সমাধি-গুলোর দিকে এবং শুরু করেন সর্ব প্রথম হযরত ইব্রাহিম (আ.) থেকে, যিনি সর্বপ্রথমে জেরুজালেমে সমাহিত হয়েছেন। মুসলমানরা এগুলোকে সাজিয়ে তোলেন এবং এ সবের পবিত্রতা, লাবণ্য ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনেন। রোমান, প্যাগান ও খৃস্টানদের দীর্ঘ রাজত্বকালে চিরদিনের জন্য অধিকার বঞ্চিত য়াহ্‌দীরা পুনরায় ফিরে আসতে থাকে। মুসলমান শাসনামলে প্রথমত শুধুমাত্র দেখবার জন্য, তারপর কাজের জন্য এবং তারপর ক্রমে উপাসনা ও বসবাসের জন্য।[৫০]

---

৪৯. Aluns Al-jahil Mujier el Dine el Hanbaly, Cairo 1283 A. H. 11 : 153, 227. মূল বইয়ে 'Last' কথাটি লেখা আছে।—অনুবাদক

৫০. The position of Jerusalem in Islam. Dr. Ishak Moussa el Hosseini, Cairo 1969, P. 58-59.

আরব এবং মুসলমানগণ য়াহূদীদের সংগে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেন---যার সাক্ষ্য য়াহূদীরাই দিয়ে থাকেন কিন্তু ১৯৪৮ সালে যখন তারা একটি সম্মানজনক অবস্থায় উপনীত হলো, তখন আরবদের সংগে তাদের ব্যবহার অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রমাণিত হলো।

ব্যাবিলনের রাজা নেবুচাদনেযার যিনি খৃ. পূ. ৫৮৭ সালে য়াহূদীদেরকে বন্দী করেন, তখন থেকেই য়াহূদীরা ছিল ঘৃণিত ও অবজ্ঞার পাত্র। তাদের ছিল না কোন শান্তি, না ছিল কোন অস্তিত্ব। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিনের ভবঘুরেমি ও উদ্বাস্তু অবস্থাশেষে যেইমাত্র তারা একটি রাষ্ট্র পেল, পেল একটি পতাকা, একটি সরকার এবং পেল দুনিয়ার বুকে একটি সম্মানজনক অবস্থান, অমনি তারা ভুলে গেল সেই বাস্তব সত্য কথাটি যে, তাদের রাষ্ট্রের কখনো কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং এই ফিলিস্তিন কখনোই কোন উপ-নিবেশবাদীদের জন্য ছিল না। তারা ভুলে গেল এ কথাও যে, তাদের কৃত্রিম সত্তা কখনোই স্থায়ী ছিল না এবং তাদের এখনকার এই বাস্তবতা কখনোই আরবদের দুর্বলতা ও মতবিরোধের কারণে ছিল না। সর্বোপরি তারা এ সত্য ভুলে বসলো যে, তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় তাদের রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় নি ; বরং তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উপনিবেশিক শক্তির সহায়তায় বেয়নেটের মুখে।

সুদীর্ঘ ছাব্বিশ শতাব্দীকালের অপমান, বঞ্চনা ও গ্লানিকর অবস্থার ফলে সৃষ্ট হীনমন্যতা ও দুর্বলতা---যা তাদের মন-মস্তিষ্ক ও রগ-রেশায় ঢুকে গিয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠবার জন্য তারা একটি সামরিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে,---যা কেবলমাত্র শক্তির উপরে বিশ্বাস রাখে এবং তাদের সন্তান-দেরকে উৎসাহিত করে প্রলুব্ধকারী সামরিক আকৃতি-প্রকৃতিকে প্রশংসনীয় করবার জন্য---যা একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে এবং তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করে তাকে আরও শক্তিশালী ও উন্নতকরণের জন্য। যা তাদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে সংগঠিত করে এবং সাধারণ নাগরিকদেরকে অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ দেয়।

১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই য়াহূদীরা সারা বিশ্বকে সর্বদা এই ধারণা দেবার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে যে, আরবদের তুলনায় তারা শ্রেষ্ঠ। যে কোন ধরনের প্রোপাগাণ্ডা ও কূটনীতির মাধ্যমে নিজেদের অপরাজেয় মনোভাবকে সাড়ম্বরে প্রদর্শন করবার কোনরূপ প্রচেষ্টা

৩---

তারা বাদ দেয়নি। ইসরাঈল এটা করে থাকে বিশেষ করে তার জনগণ এবং বিশ্বের অন্যান্য এলাকার য়াহূদীদের মাঝে গভীরভাবে বদ্ধমূল দীর্ঘ-দিনের লালিত হীনমন্যতা দূর করার প্রচেষ্টা হিসেবে।

ইসরাঈলী সেনানায়কগণ তাদের অহমিকা ও আত্ম অহংকারে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর বিদেশী সাংবাদিকগণ, যারা সরকারী কিংবা সামাজিক কাজের অজুহাতে তাদের নিকট সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন—বলেছেন যে, ইসরাঈলীরা তাদের সংগে খোদায়ী মেজাজে ব্যবহার করেছে।

১৯৪৮ সাল থেকেই ইসরাঈল আরবদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও আগ্রাসনের কৌশল অনুসরণ করে চলেছে তার সেনাবাহিনী ও জনগণের নৈতিক মান উঁচু রাখবার জন্য। সে প্রতিটি আরব সামরিক তৎপরতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সর্বদা নিশ্চিতভাবে প্রস্তুত থাকে—এই ভয়ে যে, পাছে লোকে তাদেরকে দুর্বল বলে ব্যাংগ করে। অধিকন্তু সে তার জনগণের মনোবল উঁচু রাখার জন্য তাদের ঐতিহাসিক সামরিক দলিলসমূহ মিথ্যাভাবে প্রকাশ করে।

ইসরাঈলী নেতারা আশংকা করে থাকে যে, সেনাবাহিনী ও জনগণের নীচু মনোবল তাদেরকে এক স্নায়ুবিক পতনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। সে কারণে তারা তাদের সামরিক বিজয়সমূহকে অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রচার করে জনগণের ও সেনাবাহিনীর একেবারে ভেংগেপড়ার মত অবস্থা রোধ করবার জন্য।

এটা স্পষ্ট যে, ১৯৪৮-এর পর থেকে আরবদের উপর বিভিন্ন বিজয়ের কারণে ইসরাঈলীদের মনোবল এখন অনেক উঁচুতে রয়েছে। তবে এটা সুনিশ্চিত যে, মাত্র একটি পরাজয়ের ঘটনা ঘটলেই তাদের সমস্ত মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যে কোন একটি পরাজয় তাদেরকে নৈরাশ্য ও ক্রমবিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। এমনকি সমুদ্রও তখন তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অদূর ভবিষ্যতে এটা অবশ্যই তাদের জন্য ঘটবে।

(খ) আরব ভূখণ্ডসমূহ সম্প্রসারণ বজায় রাখা ঃ দ্বিতীয় উদ্দেশ্য য়াহূদীরা শক্তিছাড়া আর কিছুতেই বিশ্বাস করে না ; তাদের সম্প্রসারণ-বাদী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা প্রথমেই নির্ভর করে নিজেদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের উপর। এ বিষয়ে তারা তাদের আগ্রাসী মনোভাব কখনোই

লুকিয়ে রাখেনি। অস্ত্রশস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার জড়ো করা, ইসরাঈলের যাবতীয় বস্তুগত ও নৈতিক সম্পদ পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধের কাজে লাগানো প্রভৃতি স্বীয় সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে ইসরাঈলের কঠিন প্রতিজ্ঞার নিশ্চিত প্রমাণ বহন করে—যা ব্যতীত সে কখনোই তার আগ্রাসী লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সক্ষম হবে না।

১৯৬৫ সালে একটি আমেরিকান ম্যাগাজিনে লিখিত এক নিবন্ধে ইসরাঈলী পররাষ্ট্র মন্ত্রী (তৎকালীন) আবা ইবান বলেন, এ কথা কল্পনা করা নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ হবে না যে, আরব নেতারা আমাদেরকে ১৯৬৬ বা '৬৭ সালের সীমানায় ফিরে যেতে জিদ ধরবেন যেমন তারা জিদ ধরতেন ১৯৪৮ সালের সীমানায় ফিরে যাওয়ার জন্য—যে সীমানা তারা এককালে অস্বীকার করেছিলেন।[৫১]

ইসরাঈল তার যুদ্ধ প্রস্তুতিতে মোট জাতীয় আয়ের বৃহদাংশ ব্যয় করে, শতকরা হিসাবে যা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র, এমনকি আমেরিকা ও রাশিয়ার তুলনায়ও অধিক। ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধের জন্য ইসরাঈলের সামরিক বাজেট মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ ছাড়িয়ে যায়, যা ঐ বৎসর চার বিলিয়ান ডলারে পৌঁছে যায়।

সুইস ফেডারেল ব্যাংক ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে তার নিয়মিত মাসিক রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, ১৯৬৭ সালের পরে ইসরাঈলের বার্ষিক সামরিক বাজেটের শতকরা হার পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় বেশী। ১৯৬৮ সালের সার্বিক বাজেট ১৯৬৭-এর তুলনায় বেশী ছিল। তেমনি ১৯৬৯-এর বাজেট ৬৮-এর তুলনায় ছিল আরও বেশী।

আমরা যদি ইসরাঈলের জাতীয় আয়ের সাথে সেই বিরাট অংকের আয় শামিল করি, যা দানের আকারে কেবলমাত্র সামরিক খাতে ব্যয়ের জন্য তারা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার য়াহূদীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকে, তাহ'লে আমরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হবো যে, এই বিরাট অংক কেবলমাত্র তার আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই ব্যয়িত হয়ে থাকে।

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইসরাঈল ১৯৬৯ সালে এপ্রিলে ১২টি ফ্যান্টম বিমান এবং ১৯৭০ সালের মে, জুন, জুলাই ও অক্টোবর মাসে আরও ৫৪টি

---

৫১. 'Forei gn Affiars', July 965.

ফ্যান্টম বিমান লাভ করে। এছাড়াও সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কছে থেকে ৮০টি স্কাইহক বিমান ও ৫০০ শত মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ লাভ করেছে এবং এইভাবে চুক্তির বাকীগুলো সে পেতে থাকবে। বিমানের প্রথম চালান পাওয়ার বেশীর বেশী এক বছরের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বর-এর শেষ নাগাদ।

এ ছাড়াও ইসরাঈল নিজদেশে অস্ত্র উৎপাদনের কোন প্রচেষ্টা বাদ রাখছে না। ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ৭০-৭১ সাল পর্যন্ত ইসরাঈলের মোট জাতীয় বাজেট ছিল মিলিয়ন ডলারের হিসাবে যথাক্রমে ১৬৬৭, ১৬৮০, ২১৪৭ ও ২৮৩১ মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৭৫০, ৬২৯, ৮৪০ ও ১১৮৯ মিলিয়ন ডলার।

১৯৬৮-এর মাঝামাঝি নাগাদ তেলআবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে অধিকৃত আরব ভূখণ্ড থেকে ইসরাঈলী প্রত্যাহার সম্পর্কে তাদের মতামত যাচাই করে একটি জরীপ চালানো হয়। তাতে দেখা যায় শতকরা ৪৪ জন সমস্ত অধিকৃত আরব ভূমি ইসরাঈলের সংগে সংযুক্তি সমর্থন করে। শতকরা ৩৭ জন সংযুক্তির বিপক্ষে, ১৯ জন কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকা সংযুক্তির পক্ষে এবং মাত্র ২ জন এক্ষুণি ইসরাঈলী প্রত্যা-হারের পক্ষে রায় দিয়েছে।

১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধে ইসরাঈল যা কিছু দখল করেছে, তা সে কখনোই ছাড়বে না—আরব শক্তি, হাঁ, কেবলমাত্র আরব শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া।

ইসরাঈলের আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্যসমূহ হাসিলের জন্য তাদের নেতারা ইসরাঈলকে একটি সৈনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এবং সবকিছুতেই সামরিক ছাপ অংকিত করেছে।

১৯৬৭ সালের ১০ই অক্টোবর সংখ্যা য়াহূদী পত্রিকা হারেজ (Haaretz) -এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে বেন গুরিয়ান বলেন যে, অধিকৃত জেরুজালেম চিরকালের জন্য ইসরাঈলের রাজধানী হিসেবে থাকবে যা ৩,০০০ বৎসর পূর্বে ছিল এবং তা প্রলয়কাল অবধি থাকবে।[৫২]

১৯৬৯ সালের ৯ই জুন তারিখে লণ্ডন পৌঁছে বেন গুরিয়ান ঘোষণা করেন যে, ইসরাঈল কখনোই জেরুজালেম ও গোলান মালভূমি ছেড়ে যাবে না,

৫২. Haaretz newspaper, Tel-Aviv. 20. 1, 1970.

যদিও অন্যান্য সীমান্তে কিছু পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে। যতদিন পর্যন্ত না একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ইসরাঈল কোনক্রমেই তার ছয়দিনের যুদ্ধে দখল করা আরব এলাকা থেকে ফিরে আসবে না।

একই বছরের ২৪শে অক্টোবর লণ্ডনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বেন গুরিয়ান পুনরায় বলেন যে, ইসরাঈল অবশ্যই জেরুজালেম ও গোলান মালভূমি নিজ দখলে রাখবে।

লেভি ইসকল বলেন, ১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থায় কোন-মতেই ফিরে আসা হবে না। বর্তমানের যুদ্ধ বিরতি রেখার কোন পরিবর্তন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা স্থায়ী শান্তিচুক্তির কাঠামোর মধ্যে নিরাপদ সীমানা লাভ করা যায়। আমরা পশ্চিম তীরের কোন বসতি এলাকা—যেমন, নাবলুস, জেনিন বা অন্যান্য কোন এলাকা আটকে রাখতে চাই না। আমরা যেটার উপর জোর দিতে চাই, সেটা হলো জর্ডান নদী সত্যিকার অর্থেই আমাদের জন্য একটি নিরাপদ সীমা হবে এবং আমাদের সেনাবাহিনী কেবল ঐ সীমানা বরাবর এলাকাগুলোই দখল করবে।

আমরা বিশেষভাবে কোন বিষয়ে জোর করি না। আমরা সিনাইকে অস্ত্রমুক্ত এলাকা হিসেবে দাবী করেছি। তথাপি আমরা 'শেরম আল-শেইখে' একটি ঘাঁটি রেখে দেব যাতে আমাদের পশ্চাদরক্ষী সেনাদল সরাসরি 'তিরান' (Tiran) এলাকার প্রতিরক্ষায় কাজে লাগতে পারে। আমরা এই সব ব্যাপারে কোন চুক্তির উপরে কিংবা কোন বিদেশী (সেনাবাহিনীর) উপরে ভরসা রাখতে পারি না। জেরুজালেম এবং গোলান উপত্যকার ব্যাপারে আমাদের কোনরূপ নমনীয়তা নেই। আমরা কখনোই এগুলো ছাড়বো না।[৫৩]

১৯৬৯ সালের ৩রা জুনে প্রকাশিত এক ভাষণে তৎকালীন ইসরাঈলী প্রধান মন্ত্রী মিসেস গোল্ডামেয়ার বলেন, ১৯৬৭-এর পরে যুদ্ধ বিরতি সীমান্তের চাইতে উত্তম কোন সীমান্তের কল্পনাও আমরা করি না। আমরা অন্য কোন সীমান্ত চাই না।

ইসরাঈলী সেনাবাহিনীর কাছে প্রদত্ত অন্য এক ভাষণে, যা ১৯৬৯-এর ১০ই জুলাইয়ে প্রকাশিত হয়েছে, মিসেস গোল্ডামেয়ার বলেন যে,

---

৫৩. The American Newsweek Review--Interview of Levi, Ishkol, issue 11, 17.2.1969.

অন্যেরা সিদ্ধান্ত নেবে না আমাদের সীমানা কতদূর হবে। তোমরা যতদূর পৌঁছতে পারবে এবং দখল করতে পারবে তা-ই আমাদের সীমানার একটি অংশে পরিণত হবে।

এই বৎসর ২০শে অক্টোবরের এক ঘোষণায় তিনি বলেন, ১৯৬৭ সালের পূর্বের কোন সীমানার অস্তিত্ব এখন আর নেই। আমরা বর্তমান অধিকৃত সীমানা থেকে একইঞ্চি সরে আসবো না, যতদিন না আরবদের সংগে একটি মজবুত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

ইসরাঈলী পার্লামেন্ট 'নেসেট'-এ নতুন মন্ত্রীসভা শুরু করার সময় ১৯৬৯-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর গোল্ডামেয়ার বলেন, ইসরাঈল তার বিজিত আরবভূমিতে অবস্থান করবে যতদিন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বহাল থাকবে। কোন আন্তর্জাতিক চাপ কিংবা আরব সন্ত্রাসবাদ ইসরাঈলকে জোর করে '৬৭-এর ছয়দিন যুদ্ধের পূর্বেকার সীমান্তে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

১৯৬৮-এর ১৫ই জুনে মোশেদায়ান ঘোষণা করেন যে, আমাদের পুরুষেরা 'পার্টিশন স্কীমে'র আওতায় আরোপিত সীমান্ত স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের বংশধরেরা সেটা সংশোধন করেছে এবং ছয়দিনের বাড়িয়ে যুদ্ধে সেটা বাড়িয়ে সুয়েজ, জর্ডান ও গোলান ভূমিকে শামিল করে নিয়েছে। এটাই শেষ নয়। আমাদের নতুন যুদ্ধ বিরতি সীমান্ত জর্ডানের সীমানা অতিক্রম করবে—এমনকি লেবানন ও মধ্য সিরিয়া পর্যন্ত।

১৯৬৯-এর ২৭ শে জুন তিনি আরও বলেন, গোলান মালভূমি কখনোই সিরিয়াকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। আমরা অবশ্যই শেরম আল-শেইখ এবং ইলিয়ট[৫৪] বন্দরমুখী প্রণালী আমাদের আয়ত্তে রাখবো, একীভূত জেরুজালেম আর কখনোই বিভক্ত হবে না। তবে ইসরাঈল ইগান এলোন পরিকল্পনা (Igan Allon Project) কাঠামোর অধীনে অধিকৃত পশ্চিম তীর জর্ডানের নিকট ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। যেখানে শর্ত রয়েছে যে, পশ্চিম তীরকে জর্ডানের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হলে সেটাকে অস্ত্রমুক্ত করা হবে। কেবলমাত্র কয়েকটি ইসরাঈলী কূটনৈতিক সৈন্য ছাউনি ছাড়া, যা জর্ডান নদী বরাবর বিস্তৃত থাকবে।

---

৫৪. মূল বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠায় দুই স্থানে দু'ধরনের বানান রয়েছে। যেমন একস্থানে Eliat ও অন্যস্থানে Elait.—অনুবাদক

১৯৬৯ সালের ৩রা আগস্ট এক শ্রমিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে মোশেদায়ান বলেন যে, জর্ডান নদী—যাকে আমরা ইসরাঈলের পূর্ব সীমানা বলে মনে করি, সিরিয়ার গোলান মালভূমি ও গাযা এলাকা কখনোই ত্যাগ করা হবে না। ইলিয়ট বন্দরে ও এর দক্ষিণের নৌপথ অবশ্যই নিশ্চিত হতে হ'বে এবং আমাদের সেনাবাহিনী দ্বারা তাকে অবশ্যই নিরাপদ রাখতে হবে। যারা অবশ্যই প্রণালী এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে যা ঈসরাঈলের আঞ্চলিক সীমানার একটি অংশ।

২০শে আগস্ট তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন যে, লেবার পার্টির বার্ষিক পরিকল্পনা আসলে ইসরাঈল সরকারের বিবৃতি ও সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাখ্যা বা পর্যালোচনা। যার উদ্দেশ্য আরব সেনাবাহিনীকে জর্ডান নদীর সীমায় পৌঁছতে বিরত রাখা এবং গাযা, গোলান ও শেরম আল-শেইখ এলাকা—যা একটি স্থল করিডোর দ্বারা ইসরাঈলের সংগে যুক্ত হয়েছে, এসবের উপরে স্থায়ীভাবে দখল কায়েম রাখা।

১৫ই আগস্ট তিনি বলেন, আমাদেরকে নতুনভাবে ইসরাঈলের মানচিত্র অংকন করতে হবে। যেখানে জেরুজালেম গাযা, শেরম আলশেইখ ও গোলান এলাকা অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি আরবরা এই মানচিত্র প্রত্যাখান করে তবে আমরা তাদেরকে যুদ্ধে বাধ্য করবো।

২১শে অক্টবর '৬৯ তিনি ঘোষণা করেন, নতুন প্যালেস্টাইন অবশ্যই বিস্তৃত হবে উত্তরে গোলান মালভূমি, জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর এবং শেরম আল-শেইখ পর্যন্ত। সিনাই এলাকার একটি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য—যা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। যাকে 'য়াহূদী জিব্রাল্টার' হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

২২শে অক্টোবর তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন, একমাত্র সেই শান্তি-চুক্তিতে ইসরাঈল বিশ্বাস রাখতে পারে—যা একথা মেনে নেবে যে, সমস্ত ইসরাঈলী সীমান্ত কেবলমাত্র ইসরাঈলী সেনাবাহিনী দ্বারাই রক্ষা করা হবে।

২৩শে অক্টোবর জেরুজালেমের এক নির্বাচনী সভায় মোশেদায়ান ঘোষণা করেন যে, 'আমি শেরম আল-শেইখকে যুদ্ধাবস্থায় ইসরাঈলী সেনা-বাহিনীর দখলে রাখাকে অধিকতর পছন্দ করি শান্তি বহাল করে তাকে আরবদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার চাইতে।

১৯৬৮ সালের ২৮ শে মে মেনাহিম বেগিন ঘোষণা করেন যে, আরব ভূমিতে আমাদের এই বর্তমান অধিকার একটি আইনগত সার্বভৌমত্বের পর্যায়ে রূপান্তরিত হওয়া উচিত। কেননা অধিকৃত আরব ভূমি আসলে সেই ভূমি ; যা অন্যের অবৈধ দখল থেকে ইসরাঈল মুক্ত করেছে।

১৯৬৭-এর যুদ্ধের পর পরই 'নেসেট'-এর এক আলোচনায় তিনি বলেন, আমি আমার এই অটল দাবী কখনোই পরিত্যাগ করবো না যে, জর্ডান ও গাযার সমন্বয়ে ইসরাঈলের যে ঐতিহাসিক সীমান্ত (নীল থেকে ইউফ্রেটিস), তা-ই ইসরাঈলের প্রকৃত সীমান্ত।

১৯৬৮-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর ইসরাঈলী হেরাট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে বক্তৃতা করার সময় তিনি বলেন, আমাদের শত্রুদের মুকাবিলায় ভালভাবে সফলতা অর্জনের জন্য আমাদেরকে অধিকৃত এলাকাসমূহে কলোনী স্থাপন অভিযান শুরু করা উচিত। অধিকৃত ভূমিতে বসতি স্থাপন কেবল যথার্থ নয় ; বরং কর্তব্যও বটে। যার সম্পাদন আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য অতি জরুরী।

১৯৬৯-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইসরাঈলী ভাইস প্রেসিডেন্ট (তৎকালীন) ইগাল এলোন এক ঘোষণায় বলেন, জেরুজালেম চিরদিন ইসরাঈলের রাজধানী হিসেবে অবিভক্ত থাকবে।

তেলআবিব থেকে প্রকাশিত ইসরাঈলের অন্যতম সংবাদ-পত্র হারেসকে (Haaretz) দেওয়া '৬৯-এর ১২ই সেপ্টেম্বর এক ঘোষণায় তিনি বলেন, যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা অবশ্যই বাড়াতে হবে। কৌশলগত সুবিধার জন্যই এটা আমাদের প্রয়োজন। খুবই পরিতাপের বিষয় যে, '৬৭-এর যুদ্ধে ইসরাঈল সিরিয়ার আরও অভ্যন্তরে জাবাল আল-দ্রুয' (Jebel-el-Druze) পর্যন্ত এগিয়ে যায়নি।

একই দিনে অপর এক ঘোষণায় তিনি বলেন, 'কেবল সামরিক উপস্থিতি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ; বরং আমাদের অবশ্যই সারা বছর ধরে নাগরিক উপস্থিতি বজায় রাখতে হবে।'

Fait accompli-এর ভিত্তিতে রচিত সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্য ইসরাঈল কোন প্রকার চুক্তির অপেক্ষা না করে তার অধিকৃত ভূমিতে সঠিক ছক অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

'৬৭-এর জুন যুদ্ধের পরে সমস্ত ইসরাঈলী নেতা একসংগে বা একের পরে এক সর্বত্র একই ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইসরাঈল কখনোই জেরুজালেম থেকে অধিকার প্রত্যাহার করবে না এবং শান্তি আলোচনা কখনোই জেরুজালেমকে জড়াবে না।

গোল্ডামেয়ার নিজে দম্ভভরে বলেন যে, জর্দানী পতাকা আর কখনোই জেরুজালেমে উড়বে না।

ইসরাঈলীরা এ কথা কখনো অনুভব করে না যে, ১৯৬৭ সালে দখলীকৃত সিনাই, আল-আরিশ, গাযা, পশ্চিম তীর ও গোলান মালভূমি প্রভৃতি এলাকা তাদের অস্থায়ী দখলে রয়েছে। য়াহূদীদের দাবী অনুযায়ী এইসব এলাকার সংগে য়াহূদীদের সম্পর্ক একটি দেশ ও তার জনগণের মধ্যকার দীর্ঘদিনের গভীর সম্পর্কের ন্যায়। এবং যেহেতু তারা এককালে বহুদিন যাবত এসব এলাকায় বাস করতো, সে কারণে তাদের আইনগত অধিকার রয়েছে এখানে দখল কায়েম করার---যা কেউ রাখতে পারে না। ইসরাঈল এইরূপ একটা সুযোগের জন্য বহুদিন ধরে অপেক্ষায় ছিল।

য়াহূদী প্রশ্নে য়াহূদীবাদী আন্দোলনের সমাধান ছিল মূলত কতগুলো ধারণা, বাস্তবতা ও ধর্মীয় অংগীকার ও মতবাদের উপর ভিত্তিশীল। এই-ভাবে বহু পূর্বে ১৯০৭ সালে ইসরাঈলীদের সুসংগঠিতভাবে স্বদেশ প্রত্যা-বর্তনের সময় থেকেই য়াহূদী আন্দোলনের লক্ষ্য একই আছে।

ইসরাঈলের তৎকালীন শাসক পার্টি 'মাপাই' (Mapai) বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। ১৯৫৯ সালের নির্বাচনের সময় ২৩ তম য়াহূদী সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সম্মুখে যখন পার্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয় নিম্নোক্তভাবে 'য়াহূদী আন্দোলনের কাজ একটাই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে, সেটা হলো য়াহূদী প্রশ্নের সমাধান হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার য়াহূদীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

প্রাক্তন ইসরাঈলী প্রধান মন্ত্রী লেভী ইস্কল ১৯৬৪-৬৫ সালের জন্য লিখিত ইসরাঈল সরকারের বার্ষিক রিপোর্ট বইয়ের ভূমিকায় লিখেন যে, আমরা যদি সত্যিকারের য়াহূদীবাদী হই, প্যালেস্টাইনের য়াহূদী প্রত্যা-গমনের ব্যাপারে আমাদের দাবী পরিত্যাগ করতে পারি না; বরং সকল ব্যাপারেই তাদেরকে সাহায্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

বেন গুরিয়ান ১৯৬১ সালে এক বক্তৃতায় বলেন, প্রত্যেক য়াহূদী যে তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে আসতে অস্বীকার করবে, সে ইসরাঈলের প্রভুর দয়া-অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত হবে।

য়াহূদী জনগণের জন্য য়াহূদী আন্দোলনের মতবাদগত লক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ হলো, এককথায় 'ইসরাঈলের সীমানা নীল থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত করা' এবং এখানে পৃথিবীর সকল য়াহূদীর বসতি স্থাপন করা। যারা এ ব্যাপারে কিছু সন্দেহের মধ্যে ছিল ১৯৬৭-এর যুদ্ধ তাদের উত্তম জওয়াব।[৫৫]

৩. অর্থনৈতিক কারণ

যারা ইসরাঈলের ভৌগলিক অবস্থান গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, দেখেছেন এর কৃষির প্রয়োজনীয়তা ও য়াহূদী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপক উদ্যোগ, তারা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, এ সমস্যা সমাধানের জন্য মাত্র দু'টি বিকল্প রয়েছে।

(ক) মূল বাসিন্দাদের উৎখাত করে উর্বর আরব ভূমি দখলের মাধ্যমে ইসরাঈলের সীমানা সরাসরি বিস্তৃত করা।

(খ) আরবের পানি ব্যবহারের মাধ্যমে নাজাব এলাকার উন্নয়ন---যে পানির উৎস স্রোত এমনকি তার মোহনা পর্যন্ত আরবভূমিতে অবস্থিত। ইসরাঈল তার নাজাব এলাকা সেচ করবার জন্য নদীর স্রোত বিভিন্ন দিকে বিভক্ত করেছে। যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৯৬৪ সালের ১ম আরব শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ জর্ডান নদীর উপনদীগুলোর গতিপথ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়।

ইসরাঈল তার অধিকৃত ভূমিতে যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ নিয়েছে তা সংক্ষেপে হলো এই ঃ

১. যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা বরাবর য়াহূদী বসতি স্থাপন। যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানসমূহে ইসরাঈল ঘাঁটি গেড়েছে।

২. সমস্ত নগরী ও গ্রামসমূহ থেকে অধিবাসীদের উৎখাত করা এই খোড়া অজুহাতে যে, তারা প্যালেস্টাইন প্রতিরোধ শক্তিসমূহকে সহযোগিতা করে।

---

৫৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, 'Israeli militarism' p. 58-63.

অন্যান্য কৌশলের মধ্যে এটি একটি ব্যাপক দণ্ডযোগ্য কৌশল যা সে সম্প্রতি অবলম্বন করেছে তার সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য।

৩. জেলাসমূহের নতুন য়াহূদী নামকরণ এবং তখনকার সমস্ত আরব নিদর্শন মুছে ফেলার মাধ্যমে অধিকৃত আরব এলাকায় য়াহূদীবাদের ছাপ দিতে চেষ্টা করা।

৪. অধিকৃত আরবভূমি থেকে বাসিন্দাদেরকে বের করে নির্বাসন দেওয়া এবং তাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করে সমস্ত অঞ্চলকে খালি করে ফেলা।

(গ) ইসরাঈলের প্রতিরক্ষা। ইসরাঈলের মূল ভূখণ্ড এবং '৬৭-এর জুন যুদ্ধে অধিকৃত ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষার জন্য প্রবল প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন একটি উপযুক্ত সেনাবাহিনী অবশ্য প্রয়োজন।[৫৬] সে কারণেই ইসরাঈল তার সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করছে এবং তার জনগণকে বস্তুগত ও নৈতিক উভয় প্রকারেই শক্তিশালী করে তুলছে।

মোশেদায়ান সেনাবাহিনী প্রধান থাকা কালে ১৯৫৫ সালের ৫ই জানুয়ারী লিখিত 'ইসরাঈলের সীমানা ও নিরাপত্তা সমস্যা' নামক এক নিবন্ধে বলেন যে, ইসরাঈল অস্বাভাবিক রকমের জটিল এক নিরাপত্তা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। দেশের আয়তন ৮১,০০০ বর্গমাইলের বেশী হবে না। তার সীমানা ৪০০ মাইল বিস্তৃত। এর তিনচতুর্থাংশ জনসংখ্যা হাইফা বন্দরের উত্তর থেকে তেল-আবিবের দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমিতে বাস করে। ভূমধ্যসাগর ও জর্ডান সীমান্তের মধ্যবর্তী ঘনবসতিপূর্ণ এই সরু ফালিটির প্রস্থ ১২ মাইল অতিক্রম করবে না। জেরুজালেমের ইসরাঈলী পার্লামেন্টের (নেসেট) মাত্র কয়েক শত মিটার দূরেই জর্ডানী সেনাবাহিনীকে দেখতে পাওয়া যায়।

উপকূলীয় সমতল ভূমিতে অবস্থিত ইসরাঈলের মিলিটারী হেড কোয়ার্টারগুলো জর্ডানের সীমান্তবর্তী পাহাড়গুলো থেকে খুব ভালভাবেই দেখা যায়। প্রধান সড়ক ও রেলপথগুলো খুব সহজ এবং জলদি হামলার জন্য খুলে দেওয়া যাবে। তাই বলতে গেলে শত্রুর গোলার নাগালের বাইরে ইসরাঈলের কোন স্থানই নেই নাজাব মরু এলাকা ছাড়া।[৫৭]

---

৫৬. ইসরাঈলী সেনাবাহিনীতে নিয়মিত যোদ্ধা সংখ্যা বর্তমানে (১৯৭০) ইং ২৫ হাজার থেকে ৮০ হাজারে উন্নীত হয়েছে।—লেখক

৫৭. American foreign affairs magazine p. 250. Issue of January 1955.

ইসরাঈলী তদন্ত ব্যুরো প্রধান হেইম হার্জগ (Haim Hertzog) মিলিটারী সেন্সরশীপের উপরে বক্তৃতা প্রবর্তন করেন। তিনি ১৯৬১-এর ৩০শে মে তেল-আবিবে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে যোগদানরত আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার (I.P.I.) প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেন যে, আপনারা এখন ইসরাঈলের সংগে যুদ্ধাবস্থায় উপনীত জর্দানী সেনাবাহিনীর মধ্যম ধরনের বন্দুকের নাগালের মধ্যে বসে আছেন। এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে হার্জলিয়ায় (Hertzlia) আপনারা সম্মেলন করার পরিকল্পনা করেছিলেন—যা ছিল ঐ একই সেনাবাহিনীর ভূমিবন্দুকের (Field gun) নাগালের মধ্যে। আপনারা ইসরাঈলী পার্লামেন্ট নেসেট (Kenesset) পরিদর্শন করবেন সেটাও জর্ডানী সেনাবাহিনীর মর্টারের গোলার নাগালে, যেখানে লোকেরা ঐ সমস্ত সরকারী অফিস ভবনেই পিস্তলের গুলির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।[৫৮] এক্ষণে এই সমস্যার সমাধান কি?

ইসরাঈলী হেরাট (Heirut) পার্টির[৫৯] এ্যাংলো-স্যাকসন বিষয়ক কর্মকর্তা আইজাক লাইবারম্যান এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ইসরাঈলকে বিদ্যুৎগতিতে একটা ত্বরিৎ হামলা চালাতে হবে এবং গাযা এলাকা সহ সীমান্তের সকল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে নিতে হবে। অতঃপর সমস্ত জর্ডানে ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে।[৬০]

১৯৫৬ সালে মিসরের উপর ত্রয়ী হামলার সময় বেন গুরিয়ান ইসরাঈলের নেসেটে উক্ত হামলার পক্ষে বলেন যে, এই হামলা ইসরাঈলের নিরাপত্তাকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করবে, শত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করবে এবং তার পূর্বপুরুষদের ভূমিকে অন্যায়ভাবে দখলকারীদের কবল থেকে মুক্ত করবে।

---

৫৮. (T.C. Hurewitz) : The role of the military and government in Israel.

৫৯. Terrorist-roots for the Israili Heirut party, Bassam Abu Gazaleh, Beirut, 1966. P. 67-75.

৬০. A declaration published in the pumphlet 'The Arab palestinian refugee' The Arab palestinian refugees office, April 1956.

পুনরুক্তির কারণে পরবর্তী প্যারাটির অনুবাদ বাদ দেওয়া হলো।—অনুবাদক

১৯৬৭ সালে লেভি ইস্কল বেন গুরিয়ানের ন্যায় একই যুক্তি পেশ করেন এবং তা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব মোশেদায়ান ও তার সেনাবাহিনীর উপর ছেড়ে দেন।

ইসরাঈল তার দখলকৃত আরবভূমি স্বীয় অধিকারে রাখার জন্য বার বার সীমান্ত নিরাপত্তার অজুহাত খাড়া করে থাকে। কিন্তু ইসরাঈলীরা সীমান্ত নিরাপত্তা চায় কেন? গাযা সেকটর, আল-আরিশ এবং সিনাই এলাকায় ইসরাঈলের আগ্রাসী লক্ষ্য সবারই জানা কথা। শেরম আল-শেইথ এবং আকাবা উপসাগরের পশ্চিম তীর দখলের ফলে আকাবা সাগরের নৌপথ ও ইলিয়াট প্রণালীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো। সুয়েজখালের পূর্বতীর দখলের ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রেখাটি ইসরাঈলের নৌ-চলাচলের জন্য নিরাপদ রইল। এই খাল ট্যাংকসমূহের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিকভাবেই একটি দারুণ বাধার সৃষ্টি করেছে। খালের দখলকৃত পূর্বতীরে যখনই আরবদের দ্বারা কোন হামলা আসবে এবং উভয় পক্ষে প্রচণ্ড গোলা বিনিময় হবে, তখন আরব বাহিনী খোলা ময়দানে বের হ'তে বাধ্য হবে, যা তাদেরকে ব্যাপক বিমান হামলার সম্মুখীন করবে।

বিমান শক্তির আধিপত্যসহ সিনাই দখল সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র বরাবর সীমান্তকে যে কোন বড় রকমের সামরিক বিপদ থেকে ইসরাঈলকে রক্ষা করবে। জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর দখলের ফলে পূর্বতীর সুনিশ্চিতভাবে পানির বাধার কারণে প্রাকৃতিক নিয়মেই নিরাপদে থাকবে।

সিরীয় উপত্যকায় অনেকগুলো পানির উৎস রয়েছে। অধিকন্তু এর একদিকে পূর্বাঞ্চলীয় ইসরাঈলী কলোনী ও উত্তর দিকে সিরীয় ভূমি থাকার প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। গোলানে (Goulan) সিরীয়-আরব বাহিনীর উপস্থিতি ইসরাঈলের নিরাপত্তার জন্য একটি সরাসরি হুমকি। অতএব ইসরাঈল তার উত্তর সীমান্তের প্রতিরক্ষার জন্যও এই সামরিক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটির উপর এবং এই উপত্যকা ও হারমন পর্বতের পানির উৎসগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য এই এলাকাটিকে নিজ দখলে আনা অত্যন্ত জরুরী মনে করে। ওদিকে গোলানে ইসরাঈলী বাহিনী পূর্বে ডেরা (Deraa) এবং পশ্চিমে দামেশ্‌ক পর্যন্ত বিস্তৃত সিরীয় ভূখণ্ডের জন্য হুমকির সৃষ্টি করেছে।

সিরীয় উপত্যকার একটি বিশেষ সামরিক কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। যারা এই উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করবে তারাই লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান ও প্যালেস্টাইন নিয়ন্ত্রণ করবে।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে ১৩ হিজরী সনের ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধ এইস্থানেই সংঘটিত হয়। এবং এ কথা সবাই জানেন যে, ইয়ারমুক ছিল একটি সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় এবং এই অঞ্চলের উপর মুসলিম শক্তির নিয়ন্ত্রণ কায়েম হওয়ার ফলে তাদের পক্ষে লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান ও প্যালেস্টাইন বিজয় অতি সহজেই সম্ভব হয়।

এ কারণেই ১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধের পরে মোশেদায়ান ঘোষণা করেন, ইসরাঈলী সীমান্তসমূহের প্রতিরক্ষা পূর্বে যা ভাবা হ'তো, তার চেয়ে এখন অনেক বেশী সহজ হয়েছে।[৬১]

ইসরাঈলের শাসক লেবার পার্টির সম্মেলনে যা ১৯৬৯-এর ৫ই আগস্ট সমাপ্ত হয়—একথা প্রকাশ করা হয় যে, ইসরাঈল তার অধিকৃত এলাকা থেকে সরে আসবে না। মোশেদায়ান, যিনি এই পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা—ঘোষণা করেন যে, ইসরাঈল তার অধিকৃত জেরুজালেম, গাযা, সিনাই, সিরিয়া উপত্যকা এবং পশ্চিম তীরে অবস্থান করতে চায়। ইসরাঈল জর্ডান নদীকে তার নিরাপদ পূর্ব সীমান্ত বলে মনে করে।

৪. রাজনৈতিক কারণ

ইসরাঈলের সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী পরিকল্পনার পিছনে যে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে তার সংগে বিশ্ব য়াহূদী আন্দোলন একটি বিশেষ গুরুত্ব সংযোগ করেছে। আন্দোলন একথা উপলব্ধি করে যে, জুন যুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাজনৈতিক যোগসূত্রসমূহ একটি চূড়ান্ত সামরিক বিজয়ের পথ দেখাবে।

'৬৭-এর জুন যুদ্ধে কি কি বিষয় ইসরাঈলকে আরবদের উপর জয়লাভে সহায়তা করেছে এ ধরনের এক প্রশ্নের উত্তরে জনৈক দায়িত্বশীল ইসরাঈলী নেতা পশ্চিম জার্মান টেলিভিশনকে বলেন যে, নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় আরবদের

৬১. এই ঘোষণা ১৯৬৭-এর জুলাই মাসের প্রথমার্ধে করা হয় এবং ঐ সময়কার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকা থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়।—লেখক

উপর আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। ১. রাজনৈতিক, ২. গণতথ্য ৩. বৈজ্ঞানিক, ৪. অর্থনৈতিক ও ৫. সামরিক।[৬২]

উক্ত দায়িত্বশীল নেতা উপরিউল্লিখিত সকল বিষয়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়কেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, এর সর্বাধিক গুরুত্বের কারণে এবং সিদ্ধান্তকারী ফলশ্রুতির কারণে—যা চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য পথ দেখাতে পারে।

আরব দেশসমূহের সংগে ইসরাঈলও জাতিসংঘের একটি সদস্যদেশ। জাতিসংঘের চুক্তিনামায় কয়েকটি নিবন্ধ সংযোজিত রয়েছে, যেখানে একটি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অপর সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আগ্রাসী তৎপরতা চালানো কিংবা পরস্পরের ভূমি অন্যায় ভাবে দখলে রাখার বিরুদ্ধে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

ইসরাঈল ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে একই সংগে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সিরিয়া ও জর্ডান সহ মোট তিনটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আগ্রাসী তৎপরতা চালায়। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ কয়েকবার প্রস্তাব গ্রহণ করে। যাতে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নেওয়া ও যুদ্ধের সময় অধিকৃত ভূমি থেকে ইসরাঈলী প্রত্যাহার এবং জেরুজালেমকে কুক্ষিগত ও ইসরাঈলী অধিকারে নেওয়ারে বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করা হয়। ইসরাঈল প্রকাশ্যে জাতিসংঘের প্রস্তাবসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে।

কেউ বিস্মিত হতে পারে যে, ইসরাঈল কিভাবে জাতিসংঘ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে? কিন্তু আসলে এসব তার আগ্রাসনের প্রতি বিশেষ দেশসমূহের প্রকাশ্যে ও গোপনে সমর্থন ও উৎসাহের ফলশ্রুতি নয় কি?

মনে করুন যদি আরবরা ইসরাঈলের কোন একটি অংশ দখল করতো তা হলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কি চুপ করে থাকতো? বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি এই দখলের প্রতিবাদে কিছুই না করে পারতো?

ইসরাঈলের রাজনৈতিক তৎপরতার উদ্দেশ্যগুলো কি কি?

(ক) শান্তির বাহানা ঃ ইসরাঈল, যা প্রতিষ্ঠালাভ করেছে হিংসা, সন্ত্রাসবাদ ও রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে এবং যা অস্তিত্বলাভ করেছে য়াহুদী আন্দোলনের ভিত্তিতে সে আরব দেশসমূহে তার আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্য

৬২, The Decisive days, 149.

চরিতার্থ করার জন্য 'ভায়োলেন্স' বা হিংসাকেই একমাত্র পথ হিসেবে গভীরভাবে বিশ্বাস করে।

ইসরাঈল শান্তি প্রস্তাব পেশ করার কোন একটি সুযোগকেই ছেড়ে দেয় না। এটা কেবল প্রোপাগাণ্ডা বৈ কিছুই নয়। এর দ্বারা সে বিশ্ব জনমতকে এ কথা বুঝাতে চায় যে, সে আরবদের সংগে শান্তি চায়।

আরবদের মধ্যে যারা বহির্দেশ ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা প্রায়ই প্রশ্নের সম্মু-খীন হন যে, 'আপনারা কেন য়াহূদীদেরকে শান্তিতে বাস করতে দিচ্ছেন না?'

এইভাবে ইসরাঈলী প্রোপাগাণ্ডা বহির্বিশ্বে জনমতকে ধোকা দিয়ে প্রকৃত অবস্থার বিপরীতে আগ্রাসনবাদী জালিমকে মজলুম এবং মজলুমকে জালিম হিসেবে পেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

আরবভূমিতে বহাল তবিয়তে অবস্থান করে ইসরাঈল শান্তির বুলি আওড়াচ্ছে। সে নিজের অস্তিত্বকে সমস্ত তর্কের উর্ধ্বে নিষ্পন্ন বিষয় (Fait accompli) বলে মনে করে। সে এ বিষয়ে কোনরূপ আলোচনায় জড়াতে চায় না; বরং সে মনে করে যে, পরিশেষে আরবরা ইসরাঈলের আইনগত ও সাংবিধানিক অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবে।

ইসরাঈলীরা প্যালেস্টাইনী আরব উদ্বাস্তুদেরকে জাতিসংঘের প্রস্তা-বাবলী অনুযায়ী দেশে ফিরিয়ে আনতে অস্বীকার করেছে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘে উক্ত মর্মে প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়।

য়াহূদী নেতারা এ ব্যাপারে বহুবার ঘোষণা দিয়েছেন। কিছুসংখ্যক ফিলিস্তিনীকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ১৯৫৭ সালে বেন গুরিয়ানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ঘড়ির কাঁটা কেউ পিছনের দিকে ফিরাতে পারে না। ইসরাঈল একজন আরব উদ্বাস্তুকেও গ্রহণ করবে না।' এ ব্যাপারে সবচেয়ে সুন্দর এবং বাস্তবসম্মত সম্ভাব্য সমাধান হলো, তাদেরকে সিরিয়া ও ইরাকের কোন অনাবাদী এলাকায় পুণর্বাসন করা—যা প্রাকৃতিকভাবেই সমৃদ্ধ।[৬৩]

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সম্মুখে গোল্ডামেয়ার ১৯৬০ সালের নভেম্বরে ঘোষণা করেন, ইসরাঈল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে

৬৩. The Jewish Bulletin of information. Vol. 13, No. 14, 8th of June, 1957.

দিয়েছে যে, সে তার দেশে কোন উদ্বাস্তুকে ফিরে আসার অনুমতি দেবে না।[৬৪]

বেন গুরিয়ানের উত্তরাধিকারী লেভি ইস্কল, যাকে মনে করা হতো যে, তিনি আরবদের সংগে শান্তি চান, তিনি মধ্যপন্থী এবং যুদ্ধকে ঘৃণা করেন— তিনি ঘোষণা করেন, উদ্বাস্তু সমস্যার একমাত্র সামাধান হলো তাদেরকে আরব দেশসমূহে পুনর্বাসন করা। এতে যেমন তাদের মৌলিক স্বার্থ রক্ষা পাবে, আমাদেরও তেমনি স্বার্থরক্ষা হবে।[৬৫] তিনি আরও বলেন, আধুনিক যুগের ইতিহাসে কোন বড় ধরনের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান তাদেরকে তাদের আপন দেশে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে হয়নি।[৬৬]

ইসরাঈল আরবদের সংগে তার সীমানা সম্পর্কিত যে কোনরূপ সংশোধনীকেও অস্বীকার করেছে। যদিও উক্ত মর্মে জাতিসংঘে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তিনি যে কোন দায়িত্বশীল আরব নেতার সংগে যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত।—লেভি ইস্কলের এ কথার উদ্ধৃতি পেশ করে ফ্রান্সের নামজাদা সংবাদ পত্র 'লা মণ্ডের' সংবাদদাতা বলেন, ইস্কল তাহলে অবশ্যই একথা পুরো নিশ্চয়তার সংগে বলেছেন যে, তিনি ইসরাঈলী ভূখণ্ডের একইঞ্চি জমি ছাড়তে প্রস্তুত নন এবং তিনি একজন উদ্বাস্তুকেও কখনো ইসরাঈলে ফিরতে দেবেন না।[৬৭]

ইসরাঈল জেরুজালেম প্রশ্নে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করে বরং তা দখলের উপরে জোর দেয়। ইসরাঈল ১৯৬৭ সালের জুন মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করে; বরং উল্টো সুয়েজখালে জাহাজ চলাচলের পূর্ণ অধিকার দাবী করে বসে। সে এমনকি আরব অর্থনৈতিক বয়কট প্রত্যাহারেরও দাবী জানায় এবং '৬৭-এর যুদ্ধপূর্বকালের নিজ দেশের সীমানা বাড়াতে চায়।

ইসরাঈল কি তাহ'লে সেই শান্তি চায় যা তার নিষ্পন্ন বিষয়ের (Fait accompli) ভিত্তিতে ও তার নিজস্ব হুকুমে রচিত শর্ত অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী

৬৪. Do. Vol. 16, No. 20, 28th Nov. 1960.
৬৫. Kissinger's memoirs, 1965-1966.
৬৬. Do,
৬৭. Le Monde - Paris, 12th March 1960.

দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।[৬৮] নাকি অন্য কথায় বললে এই দাঁড়ায় যে, সে স্থায়ী শান্তির জন্য আলোচনায় বসতে প্রস্তুত কিন্তু এজন্য কোনরূপ ত্যাগ স্বীকারে ইচ্ছুক নয়।[৬৯]

উক্ত প্রবণতা বর্তমানে (১৯৭০ সাল) ইসরাঈলে খুব নিশ্চিতভাবে দেখা যাচ্ছে, যখন লেভি ইস্কল ঘোষণা করেন যে, ইসরাঈল কখনোই জেরুজালেম ও গোলান মালভূমি ছেড়ে দেবে না এবং জর্ডান নদী সব সময় ইসরাঈলের নিরাপদ উত্তর সীমানা হিসেবে থাকবে।[৭০]

লেভি ইস্কল বলেন যে, আমরা আমাদের বিজয়কে বিক্রয় করতে চাই না। এমনকি শান্তির জন্যও নয়। যে শান্তি আমাদেরকে পুনরায় যুদ্ধ বিরতি সীমানায় অথবা '৬৭-এর ৪ঠা জুনের সীমানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সে শান্তি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।[৭১]

আমরা বিস্মিত হই যে, শান্তির অর্থ সম্পর্কে ইসরাঈলের এই ধারণা কিভাবে প্রকৃত শান্তির সংগে যোগসূত্র গড়তে পারে? ইসরাঈলে প্রকৃত মনোভাব এবং তার নেতাদের দেওয়া ঘোষণাসমূহের মাঝে আমরা কিভাবে মেলাতে পারি? যেখানে তারা দাবী করছেন যে, তাঁরা কোনরূপ পূর্বশর্ত ছাড়াই আরবদের সংগে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত!

ইসরাঈলের শান্তি প্রস্তাব সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ধোকাপূর্ণ। কেননা তারা প্রধান সমস্যাগুলো বিবেচনায় আনতে চায় না যা শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান বাধা এবং যেগুলো অব্যাহত থাকলে কোন প্রকার শান্তিচুক্তিই সম্পন্ন হ'তে পারে না। এ বিষয়ে একটি প্রধান প্রশ্ন হলো ইসরাঈলের অস্তিত্ব এবং এর ফলে উদ্ভূত জটিলতা ও সমস্যাবলী। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বরে শান্তির এক আবেদন জানিয়ে আবা ইবান বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য পুনরায় যুদ্ধাবস্থায় ফিরে যাওয়া নয়; বরং আমরা চাই শান্তির দিকে এগিয়ে যেতে। আমাদের

৬৮. Burns - Between the Arabs and Israelis. London 1965, P. 51.
৬৯. Harary itar, Making the wolf vegetarian - The New look magazine vol. 6., Number 2, Feb. 196...(মূল বইতে এরূপ লেখা আছে)। —অনুবাদক
৭০. Al-Ahram, Cairo, Issue 11.2.1969.
৭১. Al-Akbar-el Youmiah, a Cairo paper, Issue of 21.2.1969.

ভবিষ্যত অবশ্যই হবে শান্তিময় ভবিষ্যত--যার ভিত্তি হবে একতা, মৈত্রী এবং যুদ্ধ ও সামরিক ভীতিমুক্ত নিশ্চিত অবস্থার উপর।[৭২]

আবা ইবান এই ঘোষণা দিচ্ছেন যখন, তখন ইসরাঈলী বাহিনী মিসর সীমানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল এবং ১৯৫৬ সালে মিসরের উপরে ইসরাঈলী আক্রমণের প্রস্তুতি পর্বে ইসরাঈল তখন গাযা ও সিনাই সেক্টরে সর্বাত্মক হামলা শুরু করে দিয়েছিল।

শান্তির এই আবেদন বিশ্ববাসীর মনোযোগকে ইসরাঈলী আগ্রাসন থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার জন্য নিঃসন্দেহে নেতাদের একটি ধোকা ও সত্য বিকৃতিকরণের অপচেষ্টা বৈ কিছুই নয়।[৭৩]

১৯৫৬ সালে মিসরের উপরের ত্রয়ী হামলা চালানোর প্রাক্কালে ইসরাঈল যে ভাবে শান্তির আশাবাদ ব্যক্ত করেছিল, ঠিক তেমনি ১৯৬৭ সালে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে করেছিল। যেমন ১৯৬৭ সালের ৩০শে মে (যুদ্ধ শুরুর মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে) তেল-আবিবের সাংবাদিক সম্মেলনে আবা ইবান ঘোষণা করেছিলেন যে, ইসরাঈল কখনো যুদ্ধ শুরু করবে না, যতক্ষণ না জাতিসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং বৃহৎ শক্তিবর্গ সম্মিলিত-ভাবে শান্তি প্রচেষ্টায় ক্লান্ত না হয়।

বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলো যখন উপরিউক্ত শান্তির ঘোষণা পরিবেশন করছিল, ওদিকে ইসরাঈল তখন তার সেনাবাহিনীতে ব্যাপক লোক ভর্তি শুরু করেছে এবং ঘরে ও বাইরে অবস্থানরত অস্ত্রবহনের ক্ষমতা সম্পন্ন সকল ইসরাঈলীকে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে। ইসরাঈল তার আগ্রাসী পরিকল্পনা চরিতার্থ করার জন্য আরবদের বিরুদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৬৭-এর যুদ্ধের পরে ইসরাঈল পুনরায় শান্তির ভান করে, কিন্তু জাতিসংঘ প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করে। যেখানে তাকে অধিকৃত আরব ভূমি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে বলা হয়েছে। উপরন্তু সে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এবং ডঃ ইয়ারিং-এর শান্তি প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করতে থাকে।

---

৭২. Ebba Iban : The voice of Israel. Now York 1957. P. 292.
৭৩. Ibrahim el-Abd : Violence and peace, Beirut 1967, P. 67-71.

প্যালেস্টাইন সমস্যা পর্যালোচনার জন্য আহুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যকার বৈঠকসমূহ অনুষ্ঠানেও সে বিরোধিতা করে এই মিথ্যা অজুহাতে যে, সে আরবদের সংগে এ ব্যাপারে সরাসরি আলোচনায় বসতে চায়।

ইসরাঈলের দায়িত্বশীল নেতাদের মাধ্যমেই শান্তি প্রস্তাবসমূহ পেশ করা হয় এবং য়াহুদী তথ্য মাধ্যমসমূহ ইসরাঈলী আগ্রাসী নীলনক্শাগুলো ঢেকে রাখার ব্যাপারে স্রেফ একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি করে মাত্র। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইসরাঈলের আগ্রাসী হামলা ও তার শান্তি প্রস্তাব পেশ করার সময়-কালের মধ্যে একটি ঘনিষ্ট সংযোগ থাকে।

শান্তি আলোচনার সুযোগে ইসরাঈল নতুন আগ্রাসনের প্রস্তুতি নেয় ওদিকে শান্তির জন্য কঠিন আশাবাদ ব্যক্ত করে। অতঃপর সে তার আগ্রাসী সামরিক তৎপরতাকে এই বলে চালিয়ে দিতে চায় যে, এর পিছনে তার উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। ইসরাঈল প্রায়ই আগ্রাসন ও সন্ত্রাস এবং শান্তির আবেদন ও তার প্রশংসা ও সমর্থন সবকিছুকে একাকার করে ফেলে।

ইসরাঈল শান্তির নামে ধোকা দেওয়ার এক নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছে। সে দাবী করে যে, সে সর্বদা সে কার্যধারাকেই সম্মুখে নিয়ে চলেছে যা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশেষ প্রবল চেষ্টার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।[৭৪] যাকে তারা মনে করে যে, তখনই হবে সত্যিকারের একটি মজবুত ও প্রতিরোধকারী শক্তি অর্জন।[৭৫] ইসরাঈলের অবিরত দাবী হলো অস্ত্র চাই, অস্ত্র, যা শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে ও তাকে রক্ষা করবে।[৭৬] অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী সমৃদ্ধ শক্তিধর ইসরাঈল ব্যতীত শান্তি কখনোই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।[৭৭] এ কারণেই ইসরাঈলের জীবনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আরবদের উপর সামরিক প্রাধান্য

---

৭৪. ইসরাঈলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লেভি ইস্কল কর্তৃক ১৯৬৪ সালে বিদেশী সংবাদ-দাতা ক্লাবে দেওয়া ভাষণ থেকে যা New look magazine-এ প্রকাশিত হয়। Tel-Aviv. Vol. 7 No. 6, p. 8.

৭৫. The New look magazine, Tel-Aviv, July 1964, p. 58.

৭৬. The Jewish information bulletin, New York, Vol. 10, No. 8 April 2, 1954.

৭৭. New York Herald Tribune, 20th December, 1965.

বজায় রাখার সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।[৭৮] বিগত ১০ বৎসর যাবত যে আপেক্ষিক শান্তি মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজ করছে, তা কেবলমাত্র ইসরাঈলের সামরিক প্রাধান্যেরই বাস্তব ফলশ্রুতি।[৭৯] এটা এ জন্য বলা হয়েছে যে, ইসরাইল শান্তির সময়ে যে যুদ্ধ করেছে তা ছিল (তাদের ভাষায়) শান্তি রক্ষা ও স্থিতিশীল তা আনয়ন করার জন্য।[৮০]

আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সঠিক প্রমাণ করবার জন্য ইসরাঈল দাবী করে যে, এইসব ঘটনা এই এলাকায় শান্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য অপরিহার্য ছিল।[৮১] ইসরাঈল শান্তি প্রত্যাশার ভান করে কিন্তু আসলে সে কখনোই শান্তি চায় না। এতদসত্ত্বেও সে তার রাজনৈতিক মাধ্যমগুলোর সহযোগিতায় বহু বিদেশী রাষ্ট্রকে ও সেইসংগে একটি বৃহৎ জনসংখ্যাকে একথা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, সে শান্তিতে বিশ্বাসী এবং শান্তি কামনা করে।

এখন এটা আরব কূটনীতির উপর বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হলো, ইসরাঈলী নেতাদের বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে তাদের আগ্রাসী পরিকল্পনার মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া।

(খ) **বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহানুভূতি আকর্ষণ ঃ** আরবদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথা বিশ্বাস করে যে, ইসরাঈল যদি শান্তিতে বিশ্বাসী না হয়, তা'হলে জাতিসংঘ তাকে বাধ্য করার ক্ষমতা রাখে এবং শান্তি প্রস্তাব গ্রহণে তার উপরে চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসরাঈল একমাত্র দেশ যার অন্তর্ভূক্ত নির্ভর করছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাব প্রতিপালনের উপর। নিম্নের বিবৃতিটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৪৯ সালের ১১ই মে তারিখে গৃহীত প্রস্তাব নং ৩৭৩/৩ থেকে নেওয়া হয়েছে।

---

৭৮. The eastern Israeli society : Middle East record, Vol. 1. London 1960. P. 175.

৭৯. ১৯৬৬ সালের ২৪শে মে তারিখে ইসরাইলী ব্রডকাস্টিং স্টেশন থেকে প্রচারিত লেভি ইস্কলের ঘোষণা।

৮০. Burns - p. 63

৮১. জর্ডানের পানি সিরিয়ায় ব্যবহারের জন্য নির্মিতব্য প্রজেক্টের (Work site) উপর ইসরাঈলী হামলা উপলক্ষে জেরুজালেম পোস্ট-এ প্রকাশিত আবা ইবানের ঘোষণা।

সেখানে বলা হয়েছে, "জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ নিম্নোক্ত কারণগুলোর ভিত্তিতে ইসরাঈলকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণে সম্মত হলো : (১) কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই ইসরাঈল জাতিসংঘ সনদ মেনে চলবে এবং সদস্য হবার পরদিন থেকেই সে উক্ত সনদ অনুযায়ী কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে চেয়েছে ; (২) বিশেষ করে সে ১৯৬৭ সালের ২৯ শে নভেম্বর ও ১৯৪৮ সালের ১১ই জানুয়ারীতে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি সম্মান পদর্শন করবে—এই মর্মে উপরিউক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়িত করার জন্য জাতিসংঘের নিয়োজিত বিশেষ রাজনৈতিক কমিটির সম্মুখে ইসরাঈলী প্রতিনিধি পূর্ণ বিবরণ ও ব্যাখ্যাসহ ইতিমধ্যেই নোটিশ প্রদান করেছে।'[৮২]

প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে জাতিসংঘ সনদ মেনে চলার উপরিউক্ত চুক্তিতে সম্মত হওয়া ইসরাঈলের একটা কূটকৌশল বৈ কিছু নয়। জাতিসংঘে প্রবেশলাভে যাতে তার বাধা দূর হয়। ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এটাই ছিল তার রাজনৈতিক ধাপ্‌পাবাজির প্রথম উদাহরণ। প্রকৃত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এইভাবে সে অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক ও স্ববিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে।

জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভ এবং উপরিউক্ত শর্তসমূহ পালনে ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার মাত্র দু'মাস পরেই ইসরাঈলী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জাতিসংঘের পুণর্মিলন কমিটির অন্তর্গত বিশেষ কমিটির নিকট ১৯৪৯ সালের ২৮শে জুলাই পেশকৃত এক সরকারী স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, 'ঘড়ির কাঁটা পিছনে ফিরে যায় না। এটা যেমন অসম্ভব কোন আরব উদ্বাস্তুর পক্ষে তাদের ফেলে যাওয়া পুরাতন আবাসভূমিতে ফিরে আসা তেমনি অসম্ভব।'[৮৩]

সদস্যপদ লাভের সাতমাস পরে ১৯৪৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর ইসরাঈলী নেসেটে বেন গুরিয়ান ঘোষণা করেন যে, জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৯ সালের ২৯ শে নভেম্বর গৃহীত বিভক্তিকরণ প্রস্তাবকে ইসরাঈল বাতিল, অবাস্তব ও বেআইনী মনে করে।

এইভাবে ইসরাঈল জাতিসংঘের প্রস্তাবসমূহ বার বার অগ্রাহ্য করেছে এবং তা পালন করতে অস্বীকার করেছে। এমনকি সেই বক্তৃতা মঞ্চে

---

৮২. জাতি সংঘ সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব নং ৩০৩ (৩), ১১ই মে, ১৯৪৯।

৮৩. The general assembly of the United nations Document, No. 1367 annex No. 4, Chapter 3, section (H), lst. paragraph.

দাঁড়িয়ে সে সরাসরি এই সমস্ত প্রত্যাখ্যান করেছে যেখানে দাঁড়িয়ে সে একদা, ঐ প্রস্তাবসমূহ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিল। সে প্রস্তাবে প্যালেস্টাইনকে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করা এবং ফিলিস্তিন উদ্বাস্তুদেরকে তাদের স্বদেশভূমিতে ফিরে আসার অধিকার অনুমোদন করা হয়েছে।

অথচ এরপরেও জাতিসংঘ প্রতিটি বৈঠকে উপরিউক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্ত-বায়নের পুনঃ পুনঃ নিশ্চয়তা ব্যক্ত করে আসছে। সম্ভবত পবিত্র ভূমিতে (জেরুজালেম) আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের প্রধানের দেওয়া রিপোর্ট সহ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের রেকর্ডসমূহ পর্যা-লোচনা করলে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, সে কখনোই যুদ্ধবিরতি চুক্তির সম্মান প্রদর্শন করেনি এবং সে সর্বদা এগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছে যাতে তার স্বার্থ রক্ষা পায় ও তার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়।[৮৪]

ইসরাঈল সেই সমস্ত এলাকায় আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করেছে, যে সব এলাকা থেকে সে তার আক্রমণ তৎপরতা চালিয়ে থাকে।[৮৫] তারা তাদেরকে নির্জন এলাকাসমূহে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে বাধা দিয়েছে।[৮৬] এবং বাধা দিয়েছে অধিকৃত আরব ভূমিতে যেতে।[৮৭] ইসরাঈল আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের পেছনে গুপ্তচর লাগিয়েছে, তাদের ফাইলসমূহ সেন্সর করেছে, এমনকি তারযোগ প্রেরিত তাদের গোপন সংবাদাদির পিছনেও চরম বেআইনীভাবে আড়ি পেতেছে।[৮৮] এসব দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসরাঈল ঐ সমস্ত জনশূন্য (No man's land) এলাকা ও সীমান্তের ভূমি থেকে হাজার হাজার আরব অধিবাসী বিতাড়িত করে অন্যায়ভাবে তাদের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করেছে এবং বিরাট এলাকা

---

৮৪. Von-Horn-general Karj : A military peace mission, London 1966, p. 79.

৮৫. Burns, p. 55.

৮৬. Hutchinson, The violent armistice : A military observer's look on the Arab-Israeli struggle.

৮৭. Burns, p. 55.

৮৮. General von Horn described Israeli espionage operations in his book : Military mission for peace in the eighth and Nineth chapter of the book.

দখল করে নিয়েছে।[৮৯] ইসরাঈল এ সব জায়গায় তার আইনগত অধিকার দাবী করছে এবং সিরিয়া-ইসরাঈল যুদ্ধ বিরতি কমিশনের বৈঠকসমূহ বয়কট করেছে। কেননা উক্ত কমিশন ঐ সমস্ত এলাকায় ইসরাঈলী অধিকার অনুমোদন করতে অস্বীকার করেছে।[৯০] অধিকন্তু ইসরাঈল যুদ্ধ বিরতি চুক্তির ধারাসমূহ লংঘন করে উক্ত জনশূন্য এলাকাসমূহে কৃষি বসতির নাম করে সৈন্যদের জন্য দুর্গসমূহ গড়ে তুলছে এবং এইসব দুর্গ আরবদের বিরুদ্ধে হামলায় কাজে ব্যবহার করছে।

আরব সীমান্ত এলাকাসমূহে ইসরাঈলীদের অবিরত হামলা, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ও ইসরাঈলের কৃত আন্তর্জাতিক অংগীকারের প্রকাশ্য লংঘন, ইসরাঈলী আগ্রাসন, বিভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণ কমিশন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

‘৬৭-এর জুন যুদ্ধের পরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ বহু প্রস্তাব পাস করেছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল যে, ইসরাঈল অধিকৃত সকল আরব ভূমি থেকে সরে আসবে, পবিত্র নগরী জেরুজালেমকে যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে এবং ১৯৬৮ সালের মে মাসে জেরুজালেম নগরীতে সামরিক কুচকাওয়াজ করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু ইসরাঈল এসব প্রস্তাবের কোনটাই মানেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা

---

৮৯. নিম্নোক্ত দলিল ও বইসমূহে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে ঃ
(ক) General assembly document No. 1873, paper 55, para 514.
(খ) Security council document No. 3596, appendix 8.
(গ) ,, ,, No. 2067, para 44.
(ঘ) ,, ,, ,, No. 3759, part 3 of appendix, 22-23.
(ঙ) ,, ,, ,, No. 2659, para 1 of second part of appendix,
(চ) ,, ,, ,, No. 25, 1950.
(ছ) ,, ,, ,, No. 2157.
(জ) General Benikey's report to the security council of 9th Nov '52.
(ঝ) General Hutchinson : The violent armistice, p. 20-28.

৯০. Jerusalem post newspaper, issue of 29th Dec., 1967. Statement made by Ebba Iban.

ইসরাঈলকে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদে সমর্থন দিয়ে এসেছে, তার স্বার্থ রক্ষা করেছে এবং তার নীতিকে অনুসরণ করেছে।

ইসরাঈলের স্বার্থের প্রতি মার্কিন সমর্থনের নযীর অসংখ্য। তার মধ্যে একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

২৮শে এপ্রিল তারিখে নেওয়া নিরাপত্তা পরিষদের সর্বসম্মত প্রস্তাব লংঘন করে জেরুজালেমের আরব অংশের উপর দিয়ে সামরিক কুচকাওয়াজ চালানোর জন্য ইসরাঈলের বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের ব্যাপারে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৬৮ সালে ২রা মে তারিখের এক বৈঠকে কৃতসংকল্প হয়। কিন্তু আমেরিকা তাতে ভেটো দিয়ে নস্যাৎ করে দেয়।

ইসরাঈল মধ্যপ্রাচ্যে পুরাতন ও নতুন উপনিবেশবাদীদের প্রধান অবলম্বন। যা উপনিবেশিক শক্তিগুলোকে শান্তি ও যুদ্ধের সময়ে তাদের লক্ষ্য হাসিল করতে সহায়তা করে থাকে। আর এ কারণেই উপনিবেশবাদী শক্তি-গুলো ইসরাঈলের সম্প্রসারণবাদ ও তার নিরাপত্তা বজায় রাখার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে এবং অবিরত রাজনৈতিক সমর্থন ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ দিয়ে তাকে রক্ষা করে চলেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি নিঃসন্দেহে সেখানে অন্যান্য উপনিবেশিক শক্তির আর একটি ব্লক রয়েছে—যারা আমেরিকার পথেই কাজ করছে এবং তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের অনুকূলে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সুতরাং উপরের আলোচনার সার সংক্ষেপ এভাবে টানা যেতে পারে—

প্রথমত, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অধিকৃত আরবভূমি থেকে ইসরাঈলকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে এবং ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুদেরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিতে ইসরাঈলকে বাধ্য করতে সক্ষম নয়।

আরবদের পক্ষে সকল শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রচেষ্টা পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আরব সামরিক শক্তিই কেবল পারে ইসরাঈলী আগ্রাসনবাদী সম্প্রসারণ-পরিকল্পনার চির সমাধি ঘটাতে এবং পারে পবিত্র ভূমিতে আরব অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে।

দ্বিতীয়ত, এ কথা সুনিশ্চিত যে, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের উপর নির্ভর-শীলতা আরবদের কোন উপকারে আসবে না। কেননা ইসরাঈল তার

পুরাতন ও নতুন উপনিবেশিক শক্তিসমূহ ও তাদের দোসরদের মদদ পাচ্ছে। অতএব আরবদেরকে পুরোপুরি তাদের নিজস্ব সামরিক শক্তির উপরই নির্ভর করতে হবে।

তৃতীয়ত, শক্তিশালী বা শক্তি দ্বারা মদদপুষ্ট রাষ্ট্রগুলোকেই মাত্র অন্যান্য রাষ্ট্র সহানুভূতি দেখিয়ে থাকে। দুর্বলের প্রতি কেউই সহানুভূতি দেখায় না।

স্বার্থই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল পরিচালক। এখানে কোনরূপ আবেগের স্থান নেই।

(গ) অবশেষে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদনে আরবদেরকে বাধ্য করা : ইসরাঈল এ কথা ভালভাবে উপলব্ধি করে যে, ১৯৪৮ সালে তার জন্ম-লাভের পর থেকে এতদঞ্চলে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার সমাপ্তির জন্য তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপকারী হবে শক্তির জোরে আরবদেরকে অবশেষে একটি শান্তি চুক্তিতে উপনীত করা। ইসরাঈল তার চারিদিকে দুশমন প্রতিবেশীর মাঝে চিরকালের জন্য টিকে থাকতে পারে না। সব প্রতিবেশী তাকে বয়কট করেছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এবং তার অস্তিত্বের প্রতি সর্বদা হুমকি হয়ে রয়েছে। অবিরত যুদ্ধের ফলে অপরিমেয় আর্থিক ও লোক ক্ষয়ের কারণে ইসরাঈলে বর্তমানে যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাকে সে চিরকাল এড়িয়ে চলতে পারে না।

ইসরাঈল জানে যে, যুদ্ধ যতকাল ধরে চলুক না কেন, এবং তার জন্য যত রকমের ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকারের প্রয়োজন হোক না কেন, চূড়ান্ত বিজয় অবশেষে আরবদেরই হবে।

প্রাজ্ঞ য়াহূদী নেতাগণ উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ এবং সে জন্যেই তারা য়াহূদী জনগণকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে রেখেছে যাতে এক জায়গায় জড়ো হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার মত পরিস্থিতি এড়ানো যায়। আরবরা হয়তো কিছুদিনের জন্য ঘুমিয়ে আছে কিন্তু চিরকালের জন্য তারা ঘুমিয়ে থাকবে না। যদি আরবরা কাজের সঠিক দিক-নির্দেশ পায় এবং তা অনুসরণ করে তাহলে শীঘ্র হোক আর দেরীতে হোক, তারা ইসরাঈলীদেরকে ধ্বংস করবেই।

ইসরাঈলী নেতারা বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, ১৯৪৮ সালে ইসরাঈলের জন্মের ফলে সৃষ্ট বাস্তবতার নিকট আরবরা মাথানত করবে এবং তার

অস্তিত্বকে মেনে নেবে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহ তার উল্টা প্রমাণ বহন করে। ইসরাঈলের বিরুদ্ধে আরবদের ও মুসলমানদের জাতক্রোধ (Holy grudge) দিন দিন গভীর ও ভয়ংকর হচ্ছে। আরব নেতারা জানেন যে, ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দেওয়া বা তার সংগে কোনরূপ শান্তিচুক্তি করা একেবারেই অসম্ভব। কেননা এর ফলে আরবদের মধ্যে ও মুসলিম জাহানে তাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে, এমনকি জীবনটাও হারাতে হবে (যেমনভাবে মিসরের সা'দতকে হারাতে হয়েছে—অনুবাদক)। সুতরাং এ কথা নিশ্চিত যে, আরবরা কখনোই স্বেচ্ছায় ইসরাঈলকে স্বীকার করে নেবে না।

আরবদেরকে শান্তি চুক্তিতে এবং ইসরাঈলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করার জন্য ইসরাঈল হিংসার আশ্রয় নিয়েছিল। এজন্য সে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে আরব দেশসমূহের উপর কয়েকবার হামলা চালায়। কিন্তু এসব আক্রমণ আরবদের পূর্ব সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা বৃদ্ধিতে বরং সহায়ক হয়েছে।

তারপর ১৯৫৬ সালে বৃটেন ও ফ্রান্সের সহয়তায় ইসরাঈল সুয়েজ খালের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করলো এই অজুহাত দেখিয়ে যে, এর দ্বারা ইসরাঈল ও আরবদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। ইসরাঈল তখন দাবী করেছিল যে, আরবদের হামলার অগ্রগতি রোধ করার জন্য সে আগেভাগেই একটা প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলেছিল মাত্র।

ইসরাঈলের সুয়েজ অভিযানের ফলে সে তার উদ্দেশ্যসমূহ হাসিলে ব্যর্থ হলো। অপর পক্ষে এর ফলে আরবদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো এবং এটি একটি কাঁটার মতো বিদ্ধ হলো যা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার কাজ বহুগুণ এগিয়ে নিল।

১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে ইসরাঈল আরবদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়েছে। অতঃপর '৬৭ সালে যখন সে আরবদেরকে পরাজিত করলো তখন ভেবেছিল যে, আরবরা এবার তার দেওয়া শর্ত মত শান্তিচুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হবে যাতে সে আরবদের একটি বিরাট এলাকা দখলে রাখতে পারে। যাতে তার বিরুদ্ধে আরব অর্থনৈতিক অবরোধ ভেংগে দেওয়া হয় এবং সুয়েজ খালকে সে নিজস্ব ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে।

আরবরা উক্ত ব্যাপারে ইসরাঈলকে নিরাশ করেছে; বরং তাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য ইসরাঈলের বিরুদ্ধে এই দীর্ঘস্থায়ী উদ্দেশ্যে তারা সাহসিকতাপূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করেছে, জয় না হওয়া পর্যন্ত যে যুদ্ধের শেষ নেই।

সামরিক শক্তি রাজনৈতিক শক্তির একটি অংশবিশেষ। যখন দেশের কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধনে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন দেশের একমাত্র অবলম্বন হয় সামরিক শক্তি। ইসরাঈল এই নীতিই অনুসরণ করে থাকে। সে আরবদের উপরে তার দেওয়া শর্ত সাপেক্ষ জোর করে শান্তিচুক্তি চাপিয়ে দিতে চায়। ইসরাঈল কি তাহ'লে যথার্থ অর্থেই শান্তি চায় ?

আমি নিঃসন্দেহ যে, ইসরাঈল শান্তিতে বিশ্বাসী নয়, যতক্ষণ না সে শান্তি তার পরো স্বার্থ বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। সে কোন স্থায়ী শান্তির বদলে বরং সাময়িক যুদ্ধ বিরতি কামনা করে। যাতে এই অবসরে সে পুন-রায় আগ্রাসন ও সম্প্রসারণবাদী থাবা বিস্তারের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সমস্ত য়াহুদীকে একটি বৃহত্তর ইসরাঈলে সমবেত করা—যা নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস (ফোরাত) পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এর বাইরে তাদের যত কথা, সবই প্রতারণামাত্র।

১৯৫০ সালের ৭ই এপ্রিলের এক বক্তৃতায় মেনাহিম বেগিন ঘোষণা করেন যে, একটি শান্তি চুক্তি নিষ্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও ইসরাঈলী জনগণ বা ইসরাঈলের জন্য এমনকি আরবদের জন্যও কোনরূপ শান্তি আসতে পারে না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের স্বদেশ ভূমিকে পুরোপুরি স্বাধীন করতে পারবো।[১]

(ঘ) অপরাপর দেশগুলোর মধ্যে ইসরাঈলের রাজনৈতিক মর্যাদা সমুন্নত করা ঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে নিজের দেশের মর্যাদা নির্ণীত হওয়ার প্রধান বিষয় হলো শক্তি। শক্তিমানেরা সর্বদা উচ্চস্থান দখল করে থাকে, তখন দুর্বলেরা স্বভাবতই পিছনে পড়ে যায়।

জাতীয়তাবাদী চীনের বর্তমান অবস্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন—যখন জাপানীরা এর একটি বিরাট অংশ দখল করে নিয়ে ছিল। সাম্রাজ্য হারানোর পর বৃটেনের বর্তমান অবস্থান পূর্বে-কার অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন—যখন বলা হতো যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, বৃটেনের ক্ষেত্রে আজ যা সত্য, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্মানীর ক্ষেত্রেও তাই-ই-সত্য।

১. Israel an Economic and Military danger, Beirut. P. 31.

যুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর অবস্থা ছিল বিরাট। কোন রাষ্ট্রের ভাগ্য তখন হিটলারের টেলিফোনেই নির্ধারিত হতো। উদাহরণ স্বরূপ অষ্ট্রিয়া দখলের সময়কার কথা ধরা যেতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী সকল রাজনীতিকদের নিকট ছিল গর্বের বস্তু। কিন্তু যখন যুদ্ধে হেরে গেল, তখন সে তার সমস্ত রাজনৈতিক বিশিষ্টতা হারিয়ে একটা সাধারণ কলোনীতে পরিণত হলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার রাশিয়াও জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করার পরবর্তীকালের রাশিয়া কখনোই এক নয়। বর্তমানে সে বিশ্বের দু'টি বৃহত্তম শক্তির অন্যতম। সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্ষেত্রে যা সত্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই-ই সত্য। এমনিভাবে একটি বিপুলায়তন রাষ্ট্রের অবস্থা একটি ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের অবস্থা থেকে ভিন্নতর।

সে কারণেই ইসরাঈল আরব বিশ্বে তার সম্প্রসারণবাদকে বিশ্বের ও ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের মধ্যে তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করে।

উপসংহার

জিহাদের বাস্তব আবেদন

১৩৮৯ হিজরীর ৮ই জমাদিউস্‌সানী, মুতাবিক ২১ শে আগস্ট ১৯৬৯, বৃহস্পতিবার ইসরাঈল পবিত্র আল-আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগ করে, যাতে প্রাচীন মিম্বর সহ (Antique pulpit) মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ বিধ্বস্ত হয়। এই অমানবিক হামলা মুসলমান এবং আরবরা যে মসজিদকে অতি পবিত্র মনে করে, তার প্রতি ইসরাঈলের ঘৃণ্য ও পবিত্রতা নাশের একটি চরম দৃষ্টান্ত।

এটি অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় যে, আল-আকসা মসজিদের এই অগ্নি সংযোগকে কেউই বিস্ময়ের ব্যাপার হিসেবে গ্রহণ করেনি। যেহেতু বিশ্ব য়াহূদী সম্প্রদায়, এমনকি তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব থেকেই এই আশা পোষণ করে আসছে যে, তারা আল-আকসা মসজিদকে পুরা ধ্বংস করে দিয়ে সেই স্থলে সলেমানের মন্দির স্থাপন করবে। তাদের এই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে, যার মধ্যে মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি ঃ

(ক) ১৯৪৮-এ ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে ঃ য়াহূদী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে--'য়াহূদীরা প্রস্তুতি নিচ্ছে জেরুজালেম অতিক্রম করবার জন্য, আরবদের জয় করবার জন্য এবং তাদের ফেলে আসা মন্দিরে পুনরায় উপাসনা শুরু ও সেখানে তাদের রাজত্ব কায়েম করার জন্য।[৯২]

ব্রিটানিকা বিশ্বকোষে বলা হয়েছে—য়াহূদীরা ভবিষ্যতে ইসরাঈলের বিস্তৃতি, য়াহূদী রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সলেমান বেদীর পুনঃনির্মাণের স্বপ্ন দেখছে।[৯৩]

---

৯২. Hebrew encyclopaedia, London 1904.

৯৩. .. Britanica, London 1960.

প্যালেস্টাইন বৃটিশ অধিকারে থাকাকালে য়াহুদীরা তাদের আইনগত সম্পত্তি (Legal property) হিসেবে জেরুজালেমের পবিত্র মসজিদের উপর অধিকার দাবী করেছিল। ১৯২৯ সালে য়াহুদী নেতা ক্লোজ (Kloztz) ঘোষণা করেন যে, আল-আকসা মসজিদ, যা সমস্ত পবিত্র স্থানসমূহের মধ্যে সেরা পবিত্র (Holy of the holies) হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি য়াহুদীদের সম্পত্তি।

য়াহুদী বৃটিশ মন্ত্রী লর্ড মিচিট (Lord Mitchit) বলেন, সলেমান মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সেই শুভ দিন খুবই নিকটে এবং আমি আমার বাকী জীবন উৎসর্গ করবো উক্ত মন্দির সেইস্থানে নির্মাণ করবার জন্য, যেখানে আল-আকসা মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে।

(খ) **ইসরাঈলের জন্মের পরে ঃ** ইসরাঈলের জন্মলাভের পরে আল-আকসা মসজিদকে ধ্বংস করা ও সেই স্থলে সলেমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করার ইসরাঈলী পরিকল্পনা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৬৭ সালের ৬ই জুন তারিখে ইসরাঈল জেরুজালেমের প্রাচীন নগরী অধিকার করে। নগরী অধিকারের পরপরই প্রধান পুরোহিতের নেতৃত্বে ইসরাঈলী প্রেসিডেণ্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ বিলাপরত প্রাচীরের (Wailing wall) দিকে মার্চ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যেখানে মোশে দায়ান ঘোষণা করেন, "মদীনার রাস্তা এখন আমাদের জন্য খোলা" (The road to El-Medina is now open)।[১৪]

একই দিনে তারা মসজিদের চার দেওয়ালের মাঝখানে অত্যন্ত নির্লজ্জ-ভাবে নাচ-গানের মাধ্যমে এর পবিত্রতা বিনষ্ট করে (ইন্নালিল্লাহ...)

'৬৭ সালেই ইসরাঈল আল-আকসা মসজিদ সংলগ্ন প্রাচীন বিল্ডিংগুলো ভাঙতে শুরু করে এবং হিব্রু ধ্বংসাবশেষ সন্ধানে এর দেওয়ালসমূহের অভ্যন্তরে গর্ত খুঁড়তে থাকে। যাতে তারা সলেমান মন্দিরের নিদর্শন আবিষ্কারে সমর্থ হয়।

জেরুজালেম অধিকার উপলক্ষে আয়োজিত এক ধর্মীয় সম্মেলনে ইসরাঈলী ধর্ম মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, পবিত্র আল-আকসা মসজিদের ভূমি নতুন দখলের অধিকারবলে এবং দু'হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষ-গণ কর্তৃক ক্রয় করার অধিকারবলে আইনত য়াহুদী সম্পত্তি।

---

১৪. El-Medina El-Monawarah of Saudi Arabia.

সলেমান মন্দিরের পুনঃনির্মাণের জন্য ইসরাঈল সারা বিশ্বের য়াহূদী ও য়াহূদীদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

জেরুজালেমের মুসলিম বিষয়ক সুপ্রীম কাউন্সিলের নিকট ১৯৬৮ সালের ৩০ শে মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লিখিত এক চিঠিতে জনৈক আমেরিকান বলেন যে, সলেমানের মন্দির আসলে ফ্রীম্যাসনদের[৯৫] কুটির (Masonic lodge) ছিল এবং সলেমান ছিলেন সেই কুটিরের গৃহকর্তা। হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক নির্মিত আল-আকসা মসজিদ উক্ত স্থানে এবং সেই শিলাখণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যার উপরে হযরত ইবরাহিম (আ.) স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহর নামে কুরবানী দিয়েছিলেন। সলেমান মন্দিরের পুনঃ-নির্মিত রূপ দেখতে চাই বিধায় একজন ফ্রীম্যাসন সদস্য এবং এর একটি গ্রুপের নেতা হিসেবে আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী এর নির্মাণ ব্যয়ের জন্য চাঁদা সংগ্রহ অভিযানে অংশ নিয়েছি এবং এ ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য হ'লো একশত মিলিয়ন ডলার চাঁদা সংগ্রহ করা।[৯৬]

বেন গুরিয়ান প্রায়ই বলে থাকেন, 'জেরুজালেম ছাড়া ইসরাঈলের যেমন কোন অর্থ হয় না, তেমনি সলেমান মন্দির ছাড়া জেরুজালেমের কোন অর্থ হয় না।'

আল-আকসা মসজিদে আগুন লাগাবার একমাস পূর্ব থেকেই ইসরাঈলী সংবাদ-পত্রগুলো এ ব্যাপারে পরিবেশ তৈরী করে ফেলে সংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত উদ্দেশ্য হাসিলে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানায়।

উদাহরণ স্বরূপ 'লা মেরহাব' (La-Merhab) নামক একটি য়াহূদী পত্রিকা 'জেরুজালেমের সলেমান মন্দির' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সেখানে লেখা হয় যে, 'ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষকে যে কোন মূল্যে (জেরুজালেম) মুসলমানদের সকল পবিত্র স্থানসমূহ দখল করতে হবে এবং সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।'

আল-আকসা মসজিদে আগুন লাগানোর পর ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ '৬৯-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে হেবরন শহরে অবস্থিত হযরত ইবরাহীম (আ.)-

---

৯৫. ফ্রীম্যাসন 'সারাবিশ্বে কার্যরত য়াহূদীদের একটি গুপ্ত সংগঠনের নাম—অনুবাদক।

৯৬. চিঠিটির পূর্ণ বিবরণ Islamic Awaking, Kuwait No. 49, Issue 29th march. 1969 দেখুন।

এর মসজিদ দখল করে এবং আরবদের ও মুসলমানদের সকল প্রতিবাদ ও ঘৃণা সত্ত্বেও একে য়াহূদী পূজামন্দিরে (Synagogue) রূপান্তরিত করে এবং সংগে সংগে মুসলমানদের উপরে এখানে ইবাদত করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। নিঃসন্দেহে য়াহূদীরা 'ইবরাহিম মসজিদের উপর চিরস্থায়ী দখল কায়েমের উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে সেখানে আবিষ্কারমূলক পদক্ষেপ (Exploratory step) করেছে মাত্র।'

১৯৭০ সালের ২২শে জুলাই পাদ্রী লিভিঞ্জারকে হেবরনের সামরিক গভর্নর-এর বাড়ী থেকে বের হতে দেখা গেল। তাকে একজন পাদ্রীর চাইতে বরং একজন আমেরিকান রাখাল বালক বলেই মনে হচ্ছিল।

কোমরে চামড়ার বেল্টে স্বয়ংক্রিয় বন্দুক ঝুলানো এবং ডোরাকাটা স্পোর্টস জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায় তিনি ছিলেন। তাঁর সংগে প্রসিদ্ধ বৃটিশ পত্রিকা 'দি গার্ডিয়ানের' সংবাদদাতা ছিলেন। দু'জনে হেবরনের একটি পাহাড়ের উপর দিয়ে চলছিলেন, যেখানে আরব মেয়রদের বাসস্থানগুলো অবস্থিত ছিল। এমন সময় পাদ্রী লিভিঞ্জার বললেন, "আমরা এখানে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে আমাদের বসত-বাড়ী গড়ে তুলবো। আমরা প্রথমত এখানে আড়াই'শ য়াহূদী পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করবো এবং শেষ পর্যন্ত আড়াই হাজার বাসিন্দার বসবাসের সুযোগ করে দেব।"

সংবাদদাতা জিজ্ঞেস করলেন, "তখন (স্থানীয়) আরবদের ব্যবস্থা কি হবে?"

পাদ্রী উত্তর করলেন, "আমরা আরবদের পরাজিত করবো এবং বৃহত্তর হেবরনের গোড়া পত্তন করবো।"

হেবরন ইসরাঈলের একটি অংশ, যা তেল-আবিবের চাইতেও আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে একজন সম্পদশালী য়াহূদী তার বেতের ফ্যাক্টরী সুচারুরূপে পরিচালনার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য এখানে এসেছে।

গার্ডিয়ান সংবাদদাতা তার পত্রিকায় লেখেন যে, য়াহূদী বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্য হেবরনে আরব সম্পত্তিসমূহ হতে তাদেরকে বেদখল করার প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

মেনাহিম বেগিন তাঁর এক বক্তৃতায় ঘোষণা দেন যে, ইসরাঈলী ক্যাবি-নেটের একজন সদস্য হিসেবে এখানে আমার এ কথা ঘোষণা দেওয়ার

৫—

অধিকার রয়েছে যে, সরকারের নীতি কেবলমাত্র হেবরণকে ইসরাঈলের সংগে চিরস্থায়ী সংযুক্তির লক্ষ্যে কাজ করছে না; বরং ইসরাঈলের খোদা কেবলমাত্র আমাদেরকেই এককভাবে পুরা দেশ শাসন করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে কারণেই সকল অধিকৃত ভূমি ইসরাঈলের সংগে সংযুক্ত হওয়া আশু জরুরী।

জেরুজালেমের সুপ্রীম মুসলিম কাউন্সিল আল-আকসা মসজিদ সম্পর্কে য়াহুদী ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সর্বদা হুশিয়ার থাকেন, তারা (তৎকালীন) ইসরাঈলী প্রধান মন্ত্রী গোল্ডামেয়ারের নিকট দাবী করেন এই মর্মে যে, আল-আকসা মসজিদের ভিতরে নিকট যে খনন কার্য চালানো হচ্ছে, তা এখনই বন্ধ করা হোক। তারা তাকে সতর্ক করে দেন যে, এই খনন কার্যের ফলে মসজিদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বসে পড়তে পারে।

জেরুজালেমের আরব মুসলিম নেতারা এই মর্মে আশংকা প্রকাশ করেন যে, এই খনন কার্যসমূহ, যা ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০ ফুট গভীরে পৌঁছে গেছে—মসজিদের নিরাপত্তা দারুণভাবে বিঘ্নিত করবে যেমন ইতিপূর্বকার খনন-সমূহের ফলে মসজিদের অধিকাংশে দারুণ ক্ষতি হয়েছিল এখানে অগ্নি-সংযোগের আগে।

মুসলিম নেতারা আরও বলেন, বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে যে, ইসরাঈলের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ সলেমান মন্দির উদ্ধারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মসজিদের অভ্যন্তরেই একটি য়াহুদী পূজা মন্দির স্থাপন করতে চান।[১৭]

এ ব্যাপারে সুপ্রীম মুসলিম কাউন্সিলের সকল প্রতিবাদ বিফলে গেছে। হায় এই নিশ্ছিদ্র তিমিরাবরণের কি অবসান ঘটবে না?

১৯৬৮ সালে কায়রো, মক্কা এবং আম্মানে ও ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বহু সংখ্যক মুসলিম ওলামা ও রাজনীতিবিদ উক্ত সম্মেলনসমূহে যোগদান করেন। এই সকল সম্মেলনে উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলেই য়াহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানানোর ব্যাপারে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তারা আরও ঘোষণা করেন যে, জিহাদ ঘোষণার

---

১৭. See details in the Al-Ahram and Al-Jamhuria papers of Cairo in their issues of October 1, 1969.

জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত কারণসমূহের সবগুলোই ইসরাঈলের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। যেমন, ইসলামী আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে ইসরাঈলের ব্যাপক আগ্রাসন, ইসলামের অধিকাংশ পবিত্র ভূমির অমর্যাদা, আরব (মুসলিম) ফিলিস্তিনীদেরকে তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়ন এবং বয়স্ক ও শিশুদের অমানুষিক ও বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা।

অতএব জান ও মাল দিয়ে সর্বাত্মক জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য একটি ব্যাপক গণ-আন্দোলন (General mobilization) অবশ্য জরুরী হয়ে পড়েছে এবং যিনি যে এলাকারই হোন না-কেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সাধ্যমত উক্ত দায়িত্ব পালন করা।[১৮]

এর অর্থ এই যে, জিহাদ এমন একটি নির্দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে যার আর্থিক ও নৈতিক দায়িত্ব বহনে প্রতিটি মুসলিম নারী ও পুরুষ সম্মত হবেন। অন্যথায় তিনি ভগ্নামীর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং কঠিনতম শাস্তি সম্মুখীন হবেন।

ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়িত্ব এখন সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর আপতিত হয়েছে। এর কারণসমূহ হলো ইসরাঈলের আগ্রাসী সম্প্রসারণবাদ, ফিলিস্তিনী আরব মুসলিমদেরকে তাদের স্বদেশ থেকে বিতাড়ন, য়াহূদীদের দ্বারা তাদের উপর চরম অবিচার ও নিগ্রহ, আল-আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগ, কতকগুলো মসজিদের ধ্বংস সাধন, কতকগুলোকে দখল ও সেগুলোর পবিত্রতা হনন প্রভৃতি। এক্ষণে অস্ত্র বহনে সক্ষম এমন প্রত্যেক আরব মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হলো ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করা। অন্যদিকে যারা অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন, তাদেরকেও উদারভাবে ও মুক্ত হস্তে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান অবস্থায় কোন আরব বা কোন মুসলিমের পক্ষ উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে বিরত থাকার কোন অবকাশ নেই।

বিশ্বে ১০০ মিলিয়নের উপরে আরব এবং ৬০০ মিলিয়নের উপরে মুসলিম বাস করে থাকেন। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এটাই স্থিরীকৃত হয় যে, প্রত্যেক জাতির এক-দশমাংশ অস্ত্র বহনে সক্ষম থাকে। অতএব উক্ত হিসেব অনুযায়ী আরবরা প্রায় ১০ মিলিয়ন ও অন্যান্য মুসলিমগণ প্রায় ৬০ মিলিয়ন

১৮. Resolutions and recommendations of the 4th. Congress for Islamic research, Cairo, year 1388 A. H.

যোদ্ধার যোগান দিতে সক্ষম। ইসরাঈলের বর্তমান (১৯৭০ সালে) জনশক্তি আড়াই মিলিয়নের উর্ধ্বে নয়। এক্ষেত্রে আরবরা ও মুসলিমগণ যদি জিহাদে অবতীর্ণ হন তাহ'লে ইসরাঈলের অবস্থা কি হতে পারে? এছাড়াও আরবদের ও মুসলমানদের বস্তুগত ও নৈতিক শক্তি ইসরাঈলীদের চাইতে বিস্ময়কর-ভাবে অনেক বেশী।

ইসরাঈলীদের শক্তি সুসংগঠিত। সে কারণ ইসরাঈলীরা তাদের সীমা-বদ্ধ যোগ্যতা সত্ত্বেও আরবদের বিপুল শক্তিকে অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হচ্ছে। অতএব আরবদের এখন প্রয়োজন কেবল সুষ্ঠু সংগঠনের।

ইসরাঈলের জন্মলগ্ন থেকে আরবরা এবং মুসলমানরা তার প্রতি শুভেচ্ছা দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু যখন আল-আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগ করা হলো তখনই আরবরা ভীষণ ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং জেরুজালেম ও প্যালে-স্টাইনের প্রতি সহিষ্ণু মনোভাবে পোষণকারী গভর্নরদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন শুরু করলো।

১৯৬৯-এর ২২ থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর রাবাতে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। এই সম্মেলন জেরুজালেম ও প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে আরব ও মুসলিম সমাজের গভীর অনুভূতির প্রতি-ফলন ছিল। ২৬টি আরব ও মুসলিমদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগণ এই সম্মেলনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

অধিকাংশ মুসলিম দেশের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের ফল-শ্রুতি হিসেবে সাগর-উপসাগর থেকে মহাসাগর ব্যাপী সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে একটি ব্যাপক আশাবাদের সূচনা হয় যে, এই সম্মেলনের বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তাবলী শুধুমাত্র নিস্ফল উত্তেজনা সৃষ্টির পরিবর্তে সমস্ত আরব ও মুসলিম জনসাধারণকে পবিত্র জিহাদের পক্ষে পরিচালিত করবে। কিন্তু সম্মেলন অনুষ্ঠানের ফলে উদ্ভূত উচ্চাশা দপ করে নিভে গেল কয়েকটি মিটিং হওয়ার পর। এর কতকগুলি কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কারণ ছিল, কোন-রূপ পূর্ব প্রস্তুতি না থাকা—যা সম্মেলনের মধ্যকার প্রতিটি মিটিংয়েই প্রবলভাবে বিরাজ করছিল। সম্মেলন অনুষ্ঠানের পূর্বে অবশ্যই সতর্ক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল, যাতে করে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুগুলোর উপরে বিস্তারিত অবতারণা করা সম্ভব হয়।

সম্মেলনে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ হলো—আল-আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগের নিন্দা জ্ঞাপন ও ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য অধিকারের প্রতি সমর্থন দান। ইসরাঈলকে অধিকৃত আরব এলাকা থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য করার লক্ষ্যে সম্মেলন ঐ সকল দেশের প্রতি আন্তরিক আবেদন জানায়, যাদের উপরে বিশ্বশান্তি নির্ভর করছে, যাতে তারা এ ব্যাপারে ব্যক্তি-গত ও সমষ্টিগতভাবে তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করেন।[১১]

এটা স্পষ্ট যে, সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ছিল বেকার। আশা করা হয়েছিল যে, সম্মেলন জিহাদকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবে এবং প্রত্যেক মুসলিম দেশকে আর্থিক ও নৈতিকভাবে দায়িত্বসমূহ ভাগ করে দেবে এবং এটাও সিদ্ধান্ত নেবে যে. কি পদ্ধতিতে এবং কবে নাগাদ জিহাদ শুরু হবে।

নিশ্চিত ফললাভের জন্য আরব ও ইসলামী বিশ্বের আবেগকে স্বচ্ছ করার অনুকূলে যে গতি সঞ্চার হয়েছিল তা ছিল একেবারেই পরিষ্কার। যদি আরবরা সেই গতির অনুসরণ করতে পারতো, তাহ'লে তারা নিশ্চিতভাবে ইসরাঈলী আগ্রাসন রুখতে পারতো শুধু নয়; বরং জেরুজালেমের পবিত্র ভূমিতে আরব ও মুসলিম অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতো। যদি আরবরা এখনও এই গতির অনুসরণে ব্যর্থ হয় তাহ'লে ইসরাঈল রাষ্ট্র 'অবশ্যই একদিন না একদিন নীল থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে।

বিশ্ব য়াহূদী আন্দোলন তাদের সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের একটি সুপর্যালোচিত পরিকল্পনা পেশ করেছে। এই পরিকল্পনাটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ইসরাঈল তার চূড়ান্ত সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পথে খুব ধীর ও দৃঢ় গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

১৮৯৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডের 'ব্যাসল' নগরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম য়াহূদী সম্মেলনে 'বিশ্ব য়াহূদী সংবিধান' (World Zionism Cnostitution) রচিত হয় এবং উহাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়োজিত করা হয়। ফল স্বরূপ বিশ্ব য়াহূদী আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও নৈতিক সমর্থনে য়াহূদী উদ্বাস্তুদের আগমণ

১১. See the details of the statement, issued by the Congress in the Al-Ahram Newspaper of 26.9.69.

নিয়মবদ্ধ করা হয় এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদেরকে দিয়ে ১৯০৭ সাল থেকে প্যালেস্টাইনী আরব এলাকাসমূহে কলোনী স্থাপনের সূত্রপাত করা হয়।

১৯১৭ সালে 'বেলফোর' চুক্তি হয়। এটি ছিল ইসরাঈলের সর্বাপেক্ষা বড় রাজনৈতিক বিজয়। কেননা এই চুক্তিবলেই ইসরাঈল তৎকালীন সেরা উপ-নিবেশিক শক্তি গ্রেট বৃটেনের বহু আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সমর্থন লাভ করে।

১৯২৭ সালে প্যালেস্টাইনে য়াহূদী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তদনু-যায়ী য়াহূদী কলোনীর সংখ্যাও বেড়ে যায়। বিশ্ব য়াহূদী আন্দোলন প্যালে-স্টাইনের বিরাট এলাকায় জেঁকে বসে। তা চাই ক্রয়ের মাধ্যমে হোক, চাই বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে জবর দখলের মাধ্যমে হোক।

১৯৩৭ সালে প্রথম বিপুল পরিমাণের অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে পবিত্র ভূমিতে নিয়মিত য়াহূদী সেনাবাহিনী গঠনের সূত্রপাত হয়। এছাড়াও সেখানে ছিল বেশ কিছু সংখ্যাক য়াহূদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন।

১৯৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যালেস্টইনের একাংশে আইনগতভাবে য়াহূদী স্বদেশ ভূমি (Jewish National Home) প্রতিষ্ঠার অধিকার অনুমোদন করত পার্টিশন ডিক্রি (Partition decree) ঘোষণা করে।

১৯৫৭ সালে ইসরাঈল পূর্ণ নৌ-স্বাধীনতা নিয়ে আকাবা উপসাগর দিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্যবসায় পরিচালনা করে এবং ইসরাঈলী বন্দর ইলি-য়টকে কাজে লাগায়।

১৯৬৭ সালে ইসরাঈল জর্ডানের পশ্চিম তীর, গাযা, সুয়েজখালের কিনারা পর্যন্ত সিনাই এলাকা এবং সিরিয়ার (গোলান) মালভূমি দখল করে। যা ইসরাঈলের উত্তরাংশ জুড়ে আছে এবং যা মিসর, সিরিয়া ও লেবাননের স্বার্থে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষণীয় যে, ইসরাঈল প্রতি দশ বৎসর অন্তর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তার এক-একটি প্রধান লক্ষ্য হাসিল করে নিচ্ছে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ কথা স্বীকার করেন যে, য়াহূদীদের সমস্ত প্রটো-কল বা পরিকল্পনার খসড়াসমূহ তাদের বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম য়াহূদী সম্মেলনে রচনা করেন। এই সম্মেলন ১৮৯৭—১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আগামী একশত বৎসরের মধ্যে বিশ্ব য়াহূদী সম্প্র-সারণবাদ ও য়াহূদী পুনর্বাসন পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ

করে। আরব ও মুসলমানগণ কি য়াহুদীদের উক্ত লক্ষ্য হাসিলের অনুমতি দেবেন ?

ইসরাঈলের উপর আরব ও মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়লাভের জন্য এবং সেই কঠিন বিপদের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য, যা তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যতকে সংকটাপন্ন করে রেখেছে, প্রয়োজন কেবল একটিবস্তুর। সেটি হ'লো আমাদের সমস্ত নৈতিক ও মানসিক যোগ্যতাকে সুসংবদ্ধ করা, যাতে তা ঐ একটি যথাযোগ্য শক্তি হিসেবে গণ্য হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আনয়নে সক্ষম হয়। নিশ্চয় তা ইসরাঈলী সম্প্রসারণ ও য়াহুদী পুনর্বাসন পরিকল্পনায় নৈরাশ্য ডেকে আনবে।

সমস্ত রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, যতদিন আরব ও মুসলিমগণ দুর্বল থাকবে। কিন্তু যখনই তারা শক্তিশালী হবে, তাদের সকল প্রচেষ্টা সফল হবে।

১৯৬৭ সালের পর থেকে ইসারাঈলকে নিন্দা করে ও অধিকৃত আরব এলাকা থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবী জানিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদে বহু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ইসরাঈল সকল প্রস্তাবকেই পুরাপুরিভাবে এড়িয়ে গেছে। একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছানোর জন্য জাতিসংঘ এবং চারটি বৃহৎ শক্তি রাজনৈতিকভাবে বহু প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সেই সকল প্রচেষ্টা পুরোপুরিভাবেই ব্যর্থ হয়েছে।

এখন সামরিক সমাধান ব্যতীত আরবদের নিকট অন্য কোন পথ খোলা নেই, যা কেবলমাত্র শক্তির উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু এটা কিভাবে সম্পন্ন হবে?

১৩ হিজরী সনে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন ও জর্ডান বিজয়ের উদ্দেশ্যে সৈন্য পরিচালনা করেন। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, যেমন কৌশল তারা তাদের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো।

রোমান কৌশলের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা সৈন্যদলকে সম্মুখ ভাগ, মধ্যভাগ ও বিশেষ ভাগ, মোট তিনভাগে ভাগ করতো এবং দুই পাশে দু'টি বিশেষ পার্শ্ব সেনা ইউনিট রাখতো, ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতির অধীনে প্রতিটি

ব্যাটেলিয়ানে ১,০০০ হাজার করে যোদ্ধা থাকতো। এই ব্যাটেলিয়নকে (ল্যাটিন ভাষায়) 'কারদাস' (Kardous) বলা হতো।[১০০]

খালিদ (রা.) ইতোপূর্বে আরবদের গৃহীত সকল কৌশল বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কৌশলে তাঁর সেনাদলকে ৩৬টি কারদাসে ভাগ করলেন এবং রোমান-দের বিরুদ্ধে ইয়ারমুকের ময়দানে সিদ্ধান্তকারী বিজয় লাভ করলেন।[১০১]

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) যদি উক্ত যুদ্ধে আরবদের এতকালের অনুসৃত পুরাতন কৌশল অবলম্বন করতেন, তাহ'লে তিনি কখনোই জয়লাভ করতে পারতেন না।

ইসরাঈল সামগ্রিক যুদ্ধ পদ্ধতিতে (Collective war system) বিশ্বাস করে। এই যুদ্ধ পদ্ধতিতে সে তার সমস্ত বস্তুগত ও নৈতিক যোগ্যতাকে কাজে লাগায় এবং যুদ্ধের পিছনে নিয়োজিত করে।

১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধে ইসরাঈল তার পুরা জনশক্তির ১১ শতাংশকে যুদ্ধে নিয়োজিত করে। অথচ আরবরা করেছিল মাত্র ৩,০০০ হাজার ব্যক্তিকে।

ইসরাঈল তার অন্যান্য বস্তুগত যোগ্যতাকেও যুদ্ধের সময় কাজে লাগায়। এমনকি হকারদের ব্যবহৃত ঠেলাগাড়ীও যুদ্ধের ময়দানে বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। সে তুলনায় আরবরা তাদের বস্তুগত যোগ্যতাসমূহের কতটুকু যুদ্ধে লাগাতে পেরেছে? ইসরাঈল তার পুরা নৈতিক শক্তিকে যুদ্ধে লাগাতে সক্ষম ছিল, সে তুলনায় আরবরা কতটুকু তাদের নৈতিক সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে?

আরব ও মুসলিমদেরকে সামগ্রিক যুদ্ধের পথ বেছে নিতে হবে। যে পদ্ধতির অনুসরণ করতো আরবরা ১৪০০ শত বৎসর পূর্বে। যেমন পাক কালামে বলা হয়েছে ঃ

> তোমরা অভিযানে বেরিয়ে পড়ো হালকা অথবা ভারী রণ সম্ভার নিয়ে এবং জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ো আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের জান ও মাল নিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা বুঝো।[১০২]

---

১০০. ১,০০০ সৈন্যের প্রতিটি 'কারদাস' ১০টি ডিভিশনে বিভক্ত থাকতো। বিস্তারিত দেখুন Leaders of the conquest of Iraq and the Island, p. 167.

১০১. তাবারী, ৫৬৩-২; ইবনুল আছীর, ১৫৮-২।

১০২. সূরায়ে তওবা ঃ ৪১।

আমাদের সেই সব পূর্ব পুরুষ বীর-যোদ্ধাদের উত্তরসূরী সন্তানেরা কি বিংশ শতাব্দীতে এসে পুনরায় সামগ্রিক যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগে সক্ষম নয়?

চূড়ান্ত বিজয়লাভের জন্য কোন নিয়মিত সেনাবাহিনী কোনদিন এককভাবে দায়িত্ব নিতে পারে না ; বরং সমগ্র জাতি এর জন্য দায়িত্বশীল। সেনাবাহিনী মুখপাত্র (Sarehead) হিসেবে যুদ্ধ করে মাত্র। কোন আরব বা মুসলিম সাধারণ নাগরিক নিজেকে এ ব্যাপারে কোনরূপ দায়িত্বমুক্ত বলে দাবী করতে পারে না এবং নিজেকে একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে ভাবতে পারে না।

প্রতিটি আরব ও মুসলিম জনশক্তিকে এমন ঠিক ঠিক প্ল্যান মুতাবিক যুদ্ধের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে, যাতে প্রত্যেক সৈনিক বুঝতে পারে যে, তার কাজ কি এবং কি ভাবে সে কাজ সর্বোত্তম পন্থায় সম্পাদন করা যাবে।

অস্ত্র বহনে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভালভাবে অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং শিখতে হবে কি ভাবে যুদ্ধের সময়ে অন্য সৈন্যদের সংগে সহযোগিতা করতে হয়। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তাদেরকে সুসজ্জিত করতে হবে। শুধু তাই নয়, তাদেরকে একটি দায়িত্বশীল কম্যাণ্ডের অধীনে একটি ইউনিটে সুসংগঠিত করতে হবে।

আরব ও মুসলিম জনশক্তিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

(ক) যারা ইসরাঈলের নিকট প্রতিবেশী। এই এলাকার সকল অস্ত্র বহনে সক্ষম লোকদেরকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে অথবা শত্রুর লক্ষ্য হতে পারে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানসমূহের রক্ষী হিসেবে থাকতে হবে অথবা 'ফিদাঈন' উদ্ধারকারী সংগঠনে (Fedayiin Redeemers Organization) যোগদান করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকবে এবং সে তা প্রতিপালনে যথাসাধ্য চেষ্টিত থাকবে।

(খ) যারা ইসরাঈলের প্রতিবেশী নয়। তাদের মধ্যে অস্ত্র বহনে সক্ষম ব্যক্তিগণ সরাসরি নিয়মিত সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে অথবা ঐ সমস্ত জেলার স্থায়ী সেনা ইউনিটে যোগদান করবে, যে সব এলাকা থেকে সরাসরি দুশমনের বিরুদ্ধে হামলা করা সম্ভব হয়। যেমন, জর্ডান, সিরিয়া বা মিসর।

অস্ত্রবহনে সক্ষম আরব ও মুসলিম জনসাধারণের প্রশিক্ষণ, সংগঠন ও তাদেরকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রসহ যুদ্ধে যোগান দেওয়ার জন্য আবশ্যক উচ্চতর গুণসম্পন্ন সামরিক কম্যাণ্ডের।

এই কমাণ্ডকে দুই ধরনের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হবে—(১) নৈতিক সমর্থন ও (২) বস্তুগত সমর্থন।

নৈতিক সমর্থন অত্যন্ত ফলদায়ক যা সৈন্যদের মধ্যে অর্থ ও জীবনের যে কোন মূল্যের বিনিময়ে জয়লাভ না করা পর্যন্ত যুদ্ধে নিয়োজিত থাকার মত কঠিন মনোবল সৃষ্টি করে।

৬৩৪ খৃস্টাব্দে মুতাবিক ১৩ হিজরী সনে মুসলিম ও রোমান সেনাবাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের চূড়ান্ত যুদ্ধ শুর হবার পূর্ব-মুহূর্তে একজন সৈনিক প্রধান সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললো, "রোমক বাহিনী কি বিরাট সে তুলনায় মুসলিম বাহিনী কতই না ক্ষুদ্র।" প্রত্যুত্তরে খালিদ (রা.) সাথে সাথেই বললেন, "রোমক বাহিনী কতই না ক্ষুদ্র, মুসলিম বাহিনী তার তুলনায় কি বিরাট। কেননা জয়লাভের ফলে সৈন্যসংখ্যা বাড়ে এবং পরাজয়ের ফলে কমে যায়।"

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) এর দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছিলেন? তিনি সৈন্যবল ও অস্ত্রবলকে অধিক গুরুত্ব দেন নি; বরং গুরুত্ব দিয়েছিলেন বিশেষ করে সেনাবাহিনীর ও সাধারণভাবে জনগণের নৈতিক শক্তিকে।

নেপোলিয়ান বলতেন, "নৈতিক শক্তির সাথে বস্তুগত সামর্থ্যের তুলনার হার হলো ৩ : ১।" অর্থাৎ একটি সেনাবাহিনীর নৈতিক শক্তির মূল্যমান হলো শতকরা ৭৫ ও বাকী ২৫ হলো বস্তুগত শক্তি সামর্থ্যের।

বড় বড় সামরিক নেতৃবৃন্দ ও সামরিক দর্শনের ব্যাখ্যাকারকগণ নেপোলিয়ানের উক্ত মতকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

জেনারেল ফাউলার (Fowler) নামক জনৈক আধুনিক বিশেষজ্ঞ নেপোলিয়ানের উক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন। তিনি তার Arms and History নামক বইয়ে লেখেন যে, যুদ্ধের সময় নৈতিক ও বস্তুগত শক্তিসামর্থ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব সমান সমান। তিনি নীতিগতভাবে (in principle) নেপোলিয়ানের মতকে সমর্থন করেছেন কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বিস্তারিত আলোচনায় (in details) যেয়ে উক্ত মতের সংগে বৈপরীত্য ও প্রকাশ করেছেন।[১০৩]

নৈতিক শক্তি (morale) একটি মতবাদের (doctrine or dogma) সংগে সংগে তুলনীয় (synonymous)। কোন সেনাবাহিনী বা কোন জনতার পক্ষে

---

১০৩. বিস্তারিত দেখুন - The Arab Military Unity, p.129-30.

জয়লাভ সম্ভব নয় একটি মতবাদ ছাড়া—যাকে সে বিশ্বাস করে এবং তা রক্ষার জন্য জীবন ও সম্পদ কুরবানী করে।

একই জাতিভুক্ত জনগণের মধ্যে এবং একই সেনাবাহিনীর সৈনিকদের মধ্যে মন ও হৃদয়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠার মূল উৎস হলো মতবাদগত ঐক্য। এই ঐক্যবোধ সকল ব্যক্তি ও গ্রুপের মধ্যে এবং জনস্বার্থের সেবায় সকলকে পারস্পরিক সহযোগিতার সাথে পরিচালিত করে।

মতবাদের বিভিন্নতা একটি সেনাবাহিনী বা একটি জাতিকে পারস্পরিক সহযোগিতা থেকে বিরত রাখে। বরং তা একটি সৈন্যদলকে সশস্ত্র বাদকদলে এবং একটি জাতিকে দ্বন্দ্বমুখর জনগোষ্ঠিতে পরিণত করে। আরবদের মতবাদ হলো ইসলাম, যা তাদেরকে যুগ যুগ ধরে বিজয়ের পথে পরিচালিত করে আসছে—যখন তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে তখন ইসলাম তাদেরকে পুরাপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

ইসলাম আরবদের অন্তঃকরণসমূহকে আত্মসংযম, নিয়মপ্রীতি এবং সত্যের জন্য শাহাদত বরণের গভীর আগ্রহে ভরপুর করে দিয়েছে। ইসলাম শাহাদতলাভকে আরবদেরকে শ্রেষ্ঠতম বিজয় হিসেবে দেখতে শিখিয়েছে এবং তাদেরকে আত্মমর্যাদাও দিয়েছে এই গভীর বিশ্বাস যে, পৃথিবীতে তাদের কিছু করণীয় আছে।

ইবনে খালদুন আরবদের জন্য একটি মতবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তার 'আল-মুকাদ্দিমা' (Introductin) গ্রন্থে লেখেন যে, 'আরবরা কখনোই সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না একটি গভীর ধর্ম বিশ্বাসকে তারা বরণ করতে পারবে, যা নুবুওয়াত অথবা কোন মহান উত্তরাধিকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে।[১০৪]

ইসলাম থাকলে আরবরা থাকবে। ইসলাম না থাকলে আরবরা ধ্বংস হবে।[১০৫] আরবদের ব্যাপারে যা সত্য, বিশ্বের সকল অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য তা সত্য।

---

১০৪. বিস্তারিত দেখুন - 'Introduction' by Ibn Khaldun. Beirut 1967. p. 266-1.

১০৫. বিস্তারিত দেখুন - 'Arab Military Union' p. 134-35.

আরব এবং মুসলিমগণ য়াহ্‌দীদের সংগে লড়াই করছে। য়াহ্‌দীরা তাদের মতবাদের সংগে সকলে গভীরভাবে সম্পৃক্ত—যা য়াহ্‌দী ধর্ম দ্বারা অণুপ্রাণিত।

য়াহ্‌দী সেনাবাহিনীতে বহুসংখ্যক পুরোহিত রয়েছে, যারা প্রধান সামরিক পুরোহিতের অধীনে পরিচালিত। এই পুরোহিতগণ অন্যান্য সৈন্যদের চেয়ে আলাদা কর্তৃত্ব ভোগ করে।

বাইবেলের উপরে সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রশ্নোত্তর পরিচালিত হয়। তাতে বিজয়ী সৈনিকদেরকে সম্মানিত করা হয় এবং মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হয়।

সকল স্তরের য়াহ্‌দী অফিসারগণ 'ক্রন্দনরত দেওয়ালের' (wailing wall) পাশে গিয়ে তাদের নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালন করে। যেখানে ইসরাঈলী ছত্রীসেনারা (parachute unit) একহাতে বন্দুক অপর হাতে বাইবেল নিয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে।[১০৬]

১৯৭০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর যখন চারবার্গ (Cherbourg) বন্দর থেকে ছয়টি সামরিক মোটরবোট চুরি যায় এবং পরে তা নিরাপদে হাইফা বন্দরে ফিরে আসে তখন মোশেদায়ান বলেছিলেন যে, মোটর বোটগুলো বিনাসৈন্য পাহারায় পরিচালিত হয়েছে এবং সাগরের মাঝে থেকেই পুনরায় জ্বালানী নিতে সক্ষম হয়েছে এবং নিরাপদে ফিরে এসেছে। এটা এজন্যে নয় যে, তাদের প্রত্যেকটিতে চারটি করে মোটর ছিল। বরং কেবল মাত্র এইজন্যেই সম্ভব হয়েছে যে, স্বর্গীয় আত্মাসমূহ দ্বারা এ গুলো পরিচালিত হয়েছিল। পবিত্র বাইবেলে এ কথাই বলা হয়েছে যে, যখন পৃথিবী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভরে যাবে, তখন খোদায়ী আত্মা পানির উপরে ভেসে বেড়াবে।[১০৭]

এটা জানা কথা যে, কোন মতবাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় না বা তাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না অন্য একটি মতবাদ ছাড়া এবং একটি বিশ্বাসকে অপর একটি বিশ্বাস ছাড়া।

উপরের আলোচনা আরব ও মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য কেবলমাত্র ধর্মীয় নেতৃত্বের গুরুত্বের প্রতিই ইংগিত করে।

---

১০৬. The British newspaper : 'The Guardian' quoting the 'Al-Jamhouria' paper of Cairo, dated 31.3.1969.

১০৭. The 'Al-Jamhouriah', dated 16.1.1970.

দ্বিতীয় সমর্থন, যার উপরে আরব ও মুসলিম সামরিক কমাণ্ডগুলো নির্ভর করে, সেটি হলো অর্থ (Money), অর্থ যুদ্ধের জন্য স্নায়ু সদৃশ্য। অর্থ ছাড়া যুদ্ধ পুরোপুরি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

যোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ, অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, খাদ্য সরবরাহ, মেডিকেল যান ও অন্যান্য যানবাহন এবং নেতৃত্ব। অর্থ থাকলে এগুলির ব্যবস্থা করা সম্ভব কিন্তু অর্থ না থাকেলে এ সবের কিছুই যথাযথ-ভাবে করা সম্ভব নয়।

সাধারণ যোদ্ধাদের জন্য যা প্রয়োজন হয়, নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য তাই-ই প্রয়োজন হয়ে থাকে।

যোদ্ধাদের উচ্চ নৈতিকশক্তি যুদ্ধজয়ের একটি প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু এই শক্তি বজায় থাকতে পারে না, যদি না তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরিবার স্বচ্ছল অবস্থায় আছে।

সৈনিকদেরকে যে বেতন দেওয়া হয়, তা পর্যাপ্ত হওয়া উচিত, যাতে তাদের পরিবারবর্গ ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারে। কেননা এটা আশা করা কখনোই যুক্তিযুক্ত নয় যে, একজন সৈনিক যুদ্ধের ঝুঁকি ও কষ্ট বরণ করে নেবে অথচ তার চিন্তা-ভাবনা থাকবে যুদ্ধের ময়দান থেকে বহু দূরে স্বীয় পরিবারের কাছে। বিশেষ করে যদি সে তার পরিবারের একমাত্র রোযগারী ব্যক্তি হয়---যার অভাবে পরিবার উপোস থাকবে।

প্রত্যেক সৈনিকের জন্য নির্ধারিত আর্থিক আয় নিশ্চিত করতে হবে। পবিত্র যুদ্ধ বা জিহাদ পরিচালনার জন্য দান বা চাঁদার উপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল হলে চলবে না, যা কখনো উল্লেখযোগ্য হারে আবার কখনো অল্পমাত্রায় সংগৃহীত হয়। এমনকি কখনো এর প্রয়োজনীয় সংগ্রহের অভাবে যুদ্ধ বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

প্যালেস্টাইনকে কলোনী বানানোর জন্য চাঁদা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৮৯৭ সালে প্রথম ব্যাসল সম্মেলনেই। সে মতে সম্মেলন শেষ হওয়ার সাথে সাথে কতকগুলো প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় কেবল চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই। ১৮৯৮ সালে 'য়াহুদী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয় কলোনীসমূহের জন্য। ১৯০১ সালে গঠিত হয় 'জাতীয় য়াহুদী ফাণ্ড'।

য়াহুদী নন-য়াহুদী সকলেই বিশ্বব্যাপী চাঁদা সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন এবং সকল প্রকারের মাধ্যম এইজন্য ব্যবহার করা হ'তে থাকে।

পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের একজনমাত্র য়াহূদীও উক্ত ফাণ্ডে প্রতিমাসে একটা নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দিতে বাধ্য। যার যে চাঁদা ধরা হয়, তার চাইতে সে কমাতেও পারে না এবং তা থেকে বিরত থাকতেও পারে না।

যে চাঁদা তার উপরে ধার্য করা হয়, তা তার মাসিক আয়ের অনুপাতেই ধরা হয়, যাতে তার উপরে সাধ্যাতীত বোঝা না হয়ে পড়ে।

তহবিল সংগ্রহের যে নির্দিষ্ট পথ-পন্থা রয়েছে তাতে য়াহূদীরা তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট বাজেট তৈরী করতে পারে যা সংকটকালে বা অজানা কোন দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।

এমনিভাবে আরব রাষ্ট্রসমূহের সরকার ও জনগণ এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সরকার ও জনগণ সকলে মিলে ফিলিস্তিনী যোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। আরবদের উচিত একটি 'প্যালেস্টাইন ফাণ্ড' প্রতিষ্ঠা করা, যার শাখা প্রতিটি মুসলিম দেশে থাকবে। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে যোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ, তাদের বেতন প্রদান, তাদের পরিবার পোষণ এবং শহীদ যোদ্ধাদের পরিবার-সমূহকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান।

এইসব তহবিলে অর্থ সংগ্রহ হবে সুনির্দিষ্ট চাঁদা সংগ্রহ এবং আয়ের এক-দশমাংশ (One-tenth) (ওশর) গ্রহণের মাধ্যমে। যেহেতু আল্লাহ্ স্বীয় পাক কালামে তাঁর রাস্তায় নিজ নিজ আয় থেকে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমি অতি আশাবাদী হ'তে চাই না। তবে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, আরব এবং মুসলমানদের মধ্যে বহু গুণী ব্যক্তি রয়েছেন, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের সব কিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তথাপি কল্পিত অংকের অর্থসংগ্রহের পথে যেসব প্রতিবন্ধক খাড়া হয়, তার কারণ হলো, বহুসংখ্যক তহবিল সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান থাকার ফলে এমন আগ্রহী দাতা আছেন, যারা বুঝতেই পারেন না যে, কোথায় টাকাটা দিতে হবে।

প্রত্যেক জেলা, নগরী, শহর ও গ্রাম নিয়োজিত 'প্যালেস্টাইন তহবিলের' আদায়কারিগণ অবশ্যই নিজ নিজ এলাকায় সাধুতা ও আনুগত্যের জন্য প্রসিদ্ধ হবেন। যারা প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে পৃথক পৃথক রশিদ দেবেন যা প্যালেস্টাইনী যোদ্ধাদের জন্য চাঁদার প্লাবন ডেকে আনবে।

যারা ধর্মের সেবায় নিয়োজিত, তারা এ ব্যাপারে বড় সাহায্যকারী হতে পারেন। প্যালেস্টাইনী যোদ্ধাদের সেবায় ও প্যালেস্টাইন স্বার্থের পক্ষে খিদমত আনজাম দিয়ে তারা বিশ্বের সম্মুখে প্রমাণ করে দিতে পারেন যে, তারা যা বক্তৃতা করেন তা কেবল শূন্যগর্ভ কথার ফুলঝুরি নয়।

বিক্ত সামরিক কম্যাণ্ড জিহাদকে একটি গঠনমুখী বাস্তব কর্মকাণ্ডে পরিণত করতে পারেন। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত যোদ্ধাদের সংগঠন কিভাবে হবে, তার একটি বিস্তৃত ধারা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ[১০৮]

(ক) প্রতিটি আরব ও মুসলিম নগরীতে সৈনিকদের জন্য সামরিক কম্যাণ্ডের একটি কমিটি থাকবে। এই কমিটিতে নিয়মিত বা অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর কমিশনড ও নন-কমিশনড অফিসারদের মধ্য থেকে যারা উচ্চ দক্ষতা ও গভীর আনুগত্যের জন্য খ্যাত, তাদেরকে নেয়া হবে।

এই কমিটির প্রধান কাজ হবে যোদ্ধাদের একত্রিত করা, তাদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা, তাদেরকে বিভিন্ন সৈন্যদলে (Regiment) সংগঠিত করা এবং অবশেষে তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠানোর জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা।

সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞানবত্তায় প্রসিদ্ধ জাতির আধ্যাত্মিক নেতাদের সমবায়ে একটি আধ্যাত্মিক কম্যাণ্ড কমিটি গঠন করতে হবে। যারা জান ও মালের তোয়াক্কা না করে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সৈন্যদের ঈমানকে উদ্দীপিত করার মাধ্যমে সামরিক কম্যাণ্ড কমিটিকে সাহায্য করবেন।

আধ্যাত্মিক কম্যাণ্ড কমিটিতে অধিকতর ফলদায়ক করার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক আধ্যাত্মিক নেতাকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে সক্রিয় সেবাদান করতে হবে।

উপরিউক্ত দু'টি কমিটি বাদে---

(ক) সৎ ও অনুগত ব্যক্তিদের দিয়ে একটি 'অর্থ সংক্রান্ত কমিটি' থাকবে। যাদের কাজ হবে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা। অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা। আর্থিক উৎসগুলি নিয়ন্ত্রণ করা, সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেতন দেওয়া, তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ করা এবং শহীদ পরিবারগুলোর দেখাশুনা করা।

১০৮, পরিশিষ্ট 'ক' বিস্তারিত চিত্র দেখুন।

(খ) প্রত্যেক আরব ও মুসলিম দেশে একটি করে 'আঞ্চলিক কম্যাণ্ড কমিটি' থাকবে। যাতে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার ও নন কমিশনড স্বেচ্ছা-সেবিগণ থাকবেন।

এই কমিটির কাজ থাকবে বিভিন্ন কমিটির কাজের সমন্বয় সাধন করা, যাতে এটা সব সময় নিশ্চিত জানতে পারা যায় যে, সৈন্যরা যথাযথভাবে অস্ত্র সজ্জিত আছে এবং প্রয়োজন দেখা দিলেই সাথে সাথে তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যাবে। এছাড়া এ কমিটি অর্থসংক্রান্ত কমিটি ও আধ্যাত্মিক কমিটিকেও তাদের কার্যে সহায়তা দান করবে।

(গ) জেনারেল কম্যাণ্ড কাউন্সিলের কেন্দ্র থাকবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং তার কাজ হবে আরব ও মুসলিম যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পরিচালনা করা।

এই কমিটিতে থাকবেন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারগণ। যারা তাদের সাধুতা, বাস্তব, অভিজ্ঞতা, উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ, সাহস, দৃঢ়চিত্ততা ও প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ।

একজন ভাল নেতার জন্য উপরিউক্ত গুণগুলো খুবই পরিচিত। কিন্তু আমি এখানে সাধুতাকেই সবার উপরে জোর দিতে চাই।

নিম্নে একটি উদ্ধৃতির সার সংক্ষেপ উল্লেখ করা হচ্ছে। যা নেওয়া হয়েছে আল-হারসামী (El-Harthamy মৃ. ২৪৩ হি.) প্রণীত A summary of war policies (১৫ পৃ.) নামক গ্রন্থ থেকে। সেখানে বলা হয়েছে যে, "একজন সৈনিক অবশ্যই নিজেকে আল্লাহ্‌ভীতির অস্ত্রে সজ্জিত করবে। সে কখনোই আল্লাহ্‌র নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা থেকে বিরত হবে না। সে তাঁর উপরেই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং প্রার্থনা করবে তিনি যেন তার জন্য বিজয় ও নিরাপত্তা মঞ্জুর করেন। তাকে নিজের দুর্বলতা ও অসমর্থতা সম্পর্কে সদাসজাগ থাকার সাথে সাথে স্বর্গীয় হিদায়েত ব্যতিরেকে সে যে কিছুই করতে পারে না, সে কথাও মনে রাখতে হবে। তাকে সর্বদা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সাহায্য কামনা করতে হবে। একজন নেতা যখন বিজয়ী হবেন, তখন তাকে অবশ্যই যাবতীয় পাপ, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাকে সুবিচারক হ'তে হ'বে। জনগণের মঙ্গলের প্রতি মনোযোগী হ'তে হবে এবং সর্বদা সকল কাজে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে।

হারসামী উপরে যে সব গুণের কথা বলেছেন এ সব গুণের কথা আমাদের সকল প্রাচীন আরব ও মুসলিম লেখকগণ বলেছেন। কিছু লোক আছেন যারা আরব ও মুসলিম মনীষীদের মতামতে সন্তুষ্ট হতে চান না। এ ব্যাপারে তারা বরং বিদেশী লেখকদের মতামতের দিকেই বেশী মনোযোগ দিতে চান।

এইসব লোকের জন্য আমি জেনারেল মন্টগোমারীর (Monitomery) একটি মত উদ্ধৃত করতে চাই তার The Road to command নামক বই থেকে, যা ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে এবং যাতে সামরিক কম্যাণ্ডের উপর এ যাবৎকালের সর্বশেষ গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্টগোমারী লিখেছেন :

ধর্ম এবং সামরিক কম্যাণ্ডের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি? একজন নেতার জন্য অবশ্যই থাকতে হ'বে আদর্শসমূহ, যার প্রতিনিধি যত্নবান হবেন এবং থাকতে হবে ধর্মীয় গুণাবলী যা তিনি ধারণ করবেন।

তিনি আরও বলেন :

একজন নেতার ব্যক্তিগত জীবন কি বৃত্তির (Career) উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে? কিংবা তাকে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে? আমার মতে নেতা হওয়ার জন্য প্রধান বিষয় হলো তার বাধ্যতা, তার দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র এবং বিশেষ করে ধর্মীয় গুণাবলীর প্রতি আসক্তি। আমি বুঝতেই পারি না, একজন ব্যক্তি কিভাবে নেতা হ'তে পারেন, যদি তার ব্যক্তিগত জীবন সন্দেহের উর্ধ্বে না হয়। আমি বিশ্বাস করি যে, একজন নেতার সফলতার জন্য নৈতিক ও ধর্মীয় গুণাবলী সহ ন্যায়পরায়ণতাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একজন নেতার জন্য যা সত্য, সৈনিকদের জন্য তাই-ই সত্য।

আরব বিজয়ের পরবর্তীকালের অধিকাংশ আরব ও মুসলিম নেতাগণ— যারা বিরাট বিরাট বিজয় লাভ করেছেন, সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু। এখানে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি। যেমন গাযী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, যিনি ১১৮৭ খৃস্টাব্দে জেরুজালেমে ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করেছিলেন। আল-মুযাফফার কাতায, যিনি ৬৫৮ হিজরীতে তাতার-গণকে 'আইনে জালুত' (Ainjalout) নামক স্থানে পরাজিত করেন। সুলতান

মুহাম্মদ, যিনি ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করেন। এই নেতাগণ সকলেই অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন।

ইয বিন আবদুস সালাম এবং শেখ আবুল হাসান আশ্-শাহীলী নামক দুইজন ইমাম তাতারদের বিরুদ্ধে জয়লাভে কাতাযকে সাহায্য করেন। তাঁদের অবিরত ধর্মীয় প্রচারণার ফলে কাতায বুঝতে সক্ষম হন যে, পরিশেষে একমাত্র জিহাদেই ঈমানদারগণকে চূড়ান্ত বিজয় অথবা গৌরবমণ্ডিত শাহাদতের পথে পরিচালিত করতে পারে।

আমরা এখন সব চাইতে প্রয়োজন অনুভব করছি ইবনে তায়মিয়া (রহ.), ইয বিন আবদুস সালাম (রহ.), আবুল হাসান আশ্-শাহীলী (রহ.) প্রমুখ নেতার মত ব্যক্তিত্ব ; যাঁরা কোনকিছুর হিসেব না করে নিজেদের যথাসর্বস্ব একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে কুরবানী দিতে পারেন।

আমি সৈনিকদের জন্য একটি সামরিক সংগঠনের আলোচনার মধ্যেই আমার বক্তব্য কেন্দ্রীভূত রাখতে চেষ্টা করছি। যাতে তারা আধুনিক সমর-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ইসরাঈলের মত একটি আধুনিক সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করতে পারে।

আমি ফিদাঈন (গেরিলা) সংগঠন কিংবা নিয়মিত সেনাবাহিনীগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না। কেননা তাদের সংগঠন বর্তমানে পুরোপুরি সন্তোষজনক।

বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন এবং বিভিন্ন অভিযানে কৃতকার্যতালাভের কারণে ফিদাঈনের বর্তমান সংগঠন ভবিষ্যতে জিহাদ সংগঠনের জন্য উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে। ইসরাঈলের অধিকৃত আরব ভূখণ্ডে এবং বিদেশে ফিদাঈনদের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য ফল বহন করে এনেছে।

ফিদাঈন গেরিলারা আরব নৈতিকতাকে উজ্জীবিত করেছে। তারা প্যালেস্টাইনীদেরকে সংগঠিত হতে সহায়তা করেছে এবং তাদেরকে একটি সক্রিয় ও আকর্ষণীয় শক্তিতে পরিণত করেছে, যা য়াহূদী ষড়যন্ত্রকে নিরাশ করতে নিশ্চিত ফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে।

বিদেশে ফিদাঈনরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। রক্তের প্রথম অভিজ্ঞতার (Baptism of Blood) মধ্য দিয়ে মিছিল করে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে এ কথা যে, হৃতভূমি পুনরুদ্ধার করতে

যতদিন সময় লাগুক না কেন এবং যতকিছুই তাদের খোয়াতে হোক না কেন, তারা কখনোই তাদের ন্যায্য দাবী পরিত্যাগ করবে না।

ফিদাঈনরা প্যালেস্টাইন ইস্যুর প্রতি বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয় এবং তাদের তৎপরতা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভীত করে তোলে। রক্ত ঝরানোর আগ পর্যন্ত প্যালেস্টাইন প্রশ্ন একটা ইস্যুমাত্র ছিল—যা উল্লেখযোগ্য কোন ফলোদয় ছাড়াই কয়েকবারমাত্র জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের আলোচ্যসূচীতে স্থান পেয়েছিল।

ফিদাঈন তৎপরতার ফলে অধিকৃত এলাকাসমূহে য়াহূদীদের জীবন ও সম্পদ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। অধিবাসীদের মধ্যে সর্বদা ত্রাস বিরাজ করছে। ইসরাঈল তার পর্যটনখাতে প্রাপ্ত অর্থ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। য়াহূদী উদ্বাস্তুদের আগমন স্রোত বন্ধ হয়েছে। অধিকন্তু এর ফলে ইসরাঈলী সশস্ত্র বাহিনী পোষণের খরচ দ্বিগুণ হয়েছে।

ফিদাঈনদের সাফল্যের মাত্র কতকগুলো দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হলো। তারা যথার্থই জাতির গভীরতম শ্রদ্ধা ও সর্বোচ্চ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

ফিদাঈনগণ পবিত্র যোদ্ধা। তাদের অগ্রণী অভিজ্ঞতা বাস্তবক্ষেত্রে ফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে। যদিও সারা বিশ্বে আরব ও মুসলিম জনসাধারণের তুলনায় তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। মুজাহিদদের সহযোগিতায় যদি এদের সংখ্যা দ্বিগুণ করা যেত, তাহ'লে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো? ইসরাঈলীদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতো। তারা সেই কথা পুণর্ব্যক্ত করতো, যা তাদের পূর্বপুরুষেরা করেছিল যে, 'এই এলাকার লোকেরা আসলে দৈত্য।'

বিশ্বাসীরা তখন আল্লাহ্‌র জয়গানে আনন্দ মুখর হয়ে উঠতো। আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন ঃ

> আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দেব না, যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করো। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো। তিনি তোমাদের গুনাহসমূহকে ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে—যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। 'আদন

নামক জান্নাতে, পবিত্র গৃহসমূহ দান করবেন। এবং এটাই (তোমাদের জন্য) বিরাট সফলতা। এছাড়া আরও রয়েছে যা তোমরা চাও—আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং নিকট বিজয়। (হে নবী!) বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দিন।[১০৯]

জয়ের রাজপথ কেবল একটাই—আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর গভীর বিশ্বাস এবং জান ও মালের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ।

আল্লাহ্ বড় মহান। তাঁর জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক আমার নেতা, আল্লাহ্‌র নবী ও মুজাহিদীনের ইমাম মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর উপরে এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবা-ই-কিরামের উপরে।

---

১০৯. সূরায়ে সাফ্ : ১০—১৩।

মুজাহিদীন (ধর্মযোদ্ধা) সংগঠন
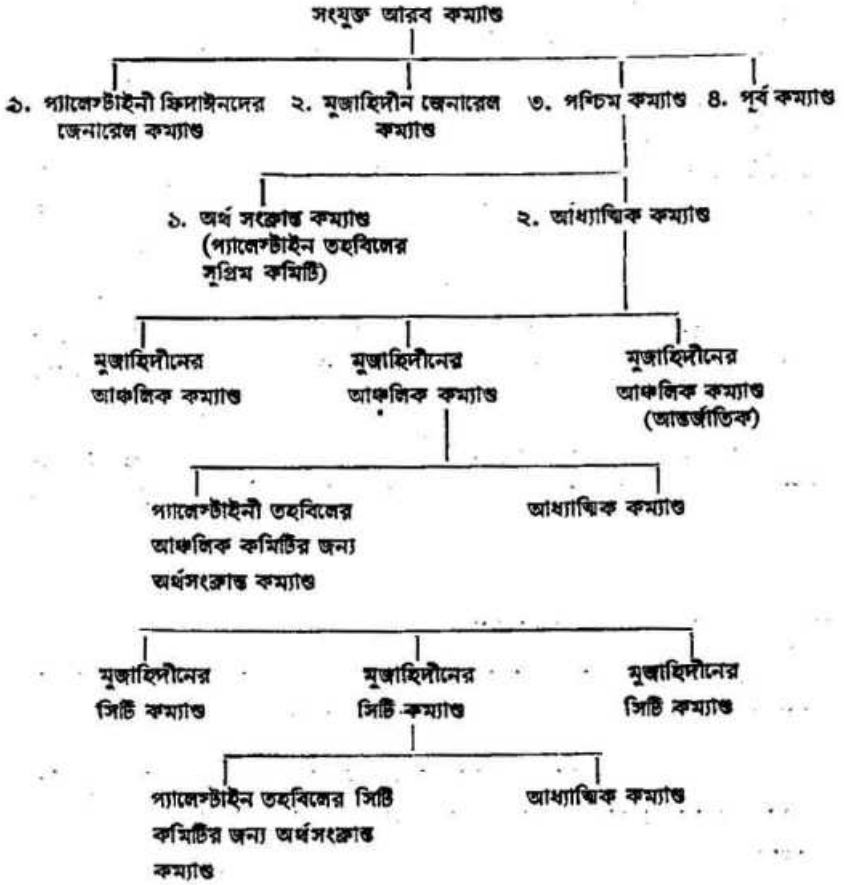
প্যালেস্টাইন তহবিল কম্যাণ্ডের অর্থনৈতিক সংগঠন
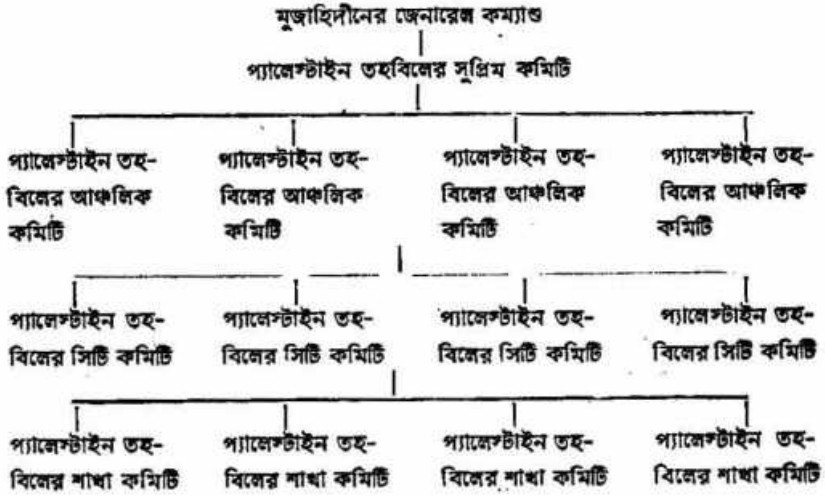
পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ'-এর মন্তব্য ঃ

১. প্যালেস্টাইন তহবিলের সর্বোচ্চ কমিটি সকল আঞ্চলিক কমিটির জন্য রশিদ বই (Official recipt) সরবরাহ করবে।

২. সংগৃহীত সকল অর্থ অবশ্যই ব্যাংকসমূহে জমা থাকবে। 'প্যালেস্টাইন তহবিল' নামে প্রত্যেক কমিটি নির্দিষ্ট ব্যাংকে বিশেষ একাউন্ট খুলবে।

৩. কমিটিসমূহের সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রত্যেক কমিটি তার উচ্চতর কমিটির নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে।

৪. 'প্যালেস্টাইন তহবিলে'র আয় সুনিশ্চিত রাখার জন্যে আমি চাই যে, প্রত্যেক আরব ও প্রত্যেক মুসলিম স্বীয় মাসিক আয়ের এক-শতাংশ প্যালেস্টাইন তহবিলে দান করবে এবং এক-দশমাংশ দান করাটা স্বেচ্ছাভিত্তিক হবে।

৫. কমিটিসমূহের স্থান নির্বাচন

(ক) সর্বোচ্চ কমিটি যুদ্ধের ময়দানের নিকটবর্তী হবে এবং মুজাহিদীনের জেনারেল কম্যাণ্ডের সাথে সর্বদা গভীর যোগাযোগ রাখবে।

(খ) আঞ্চলিক কমিটিগুলো আরব বা মুসলিম রাজধানীসমূহে থাকবে যা মুজাহিদীনের আঞ্চলিক কম্যাণ্ডের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রাখবে।

(গ) 'নগরী কমিটি' গুলো মুজাহিদীনের নগরী কমিটিসমূহের সন্নিকটে অবস্থিত হবে।

(ঘ) 'নগরী কমিটি' কর্তৃক মনোনীত স্থানসমূহে শাখা কমিটিসমূহ স্থাপিত হবে।

পরিশিষ্ট 'গ'

মুজাহিদীনের আধ্যাত্মিক কম্যাণ্ড গঠন
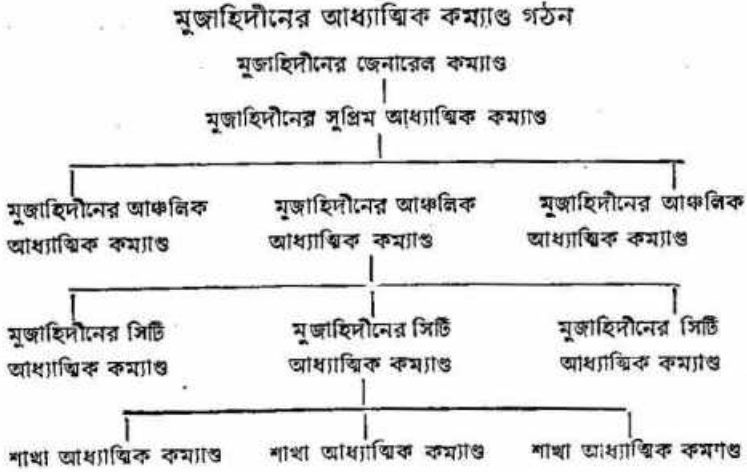
পরিশিষ্ট 'গ'-এর মন্তব্যসমূহ ঃ

১. আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান (শেইখ)-কে প্রেসিডেন্ট এবং প্রত্যেক আরব ও মুসলিম দেশসমূহ থেকে একজন করে কর্মঠ বিদ্বানকে নিয়ে মুজাহিদীনের জন্য সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক কম্যাণ্ড গঠিত হবে। এই কম্যাণ্ড মুজাহিদীনের জন্য নিয়মিত বক্তৃতামালা রচনা করবে এবং প্রত্যেক বক্তৃতার সারসংক্ষেপ সংরক্ষণ করবে।

২. অঞ্চলের প্রাণ্ড মুফতী অথবা সেরা বুদ্ধিজীবিকে প্রেসিডেন্ট করে আঞ্চলিক কম্যাণ্ড গঠিত হবে।

৩. নগরীর বিদ্বানদের নিয়ে নগরীর আধ্যাত্মিক কম্যাণ্ড গঠিত হবে।

৪. শাখা আধ্যাত্মিক কমিটিগুলো গ্রামের বিদ্বানদের নির্দেশ অনুযায়ী চলবে। যদি গ্রামে সে ধরনের বিদ্বান না পাওয়া যায়, তাহ'লে শহর থেকে একজন বিদ্বানকে প্রতিনিধি হিসেবে নিতে হবে।

৫. বিদ্বানগণ নিজেদেরকে এবং নিজেদের সহায়-সম্পদকে জিহাদের পিছনে ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

IFB-'86-87—P/3942—3.250—15. 1. 1987.